যমদূত ও দস্যু বনহুর
রোমেনা আফাজ

দস্যু বনহুর সিরিজ

যমদূত ও দস্যু বনহুর-৫৯

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো

৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

বনহুর ফিরে তাকাতেই ধপ্ ধপে সাদা আলখেল্লায় সর্ব শরীর ঢাকা লোকটার দক্ষিণ হস্তস্থিত পিস্তল থেকে গুলি বেরিয়ে এলো।

মুহূর্তে বনহুর সরে দাঁড়ালো এবং সঙ্গে সঙ্গে ঝাপিয়ে পড়লো লোকটার উপর। পিস্তলসহ হাত দু'খানা চেপে ধরলো বজ্র-মুষ্ঠিতে। শুরু হলো প্রচণ্ড ধস্তা-ধস্তি।

অল্পক্ষণেই বনহুর বুঝতে পারলো লোকটার দেহের শক্তি তার চেয়ে কম নয়। কিছুতেই তার হস্তস্থিত পিস্তল দু'টোকে সে হস্তচ্যুত করতে পারছেনা। লোকটার দেহ আলখেল্লায় ঢাকা থাকায় তার মুখমণ্ডল দেখা যাচ্ছিলোনা। কে এই লোক বোঝার কোন উপায় ছিলোনা।

বনহুর আর আলখেল্লা ধারীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চললো। কেউ কাউকে পরাজিত করতে সক্ষম হচ্ছেনা। বনহুর মুহূর্তের জন্যও লোকটাকে গুলি ছুড়বার সুযোগ দিচ্ছেনা। এক সময় আলখেল্লা ধারীকে ধরাশায়ী করলো বনহুর এবং ঐ সময় তার হাতের পিস্তল দু'টোকে কেড়ে নিলো অতি কৌশলে।

ঠিক্ ঐ দন্ডে আলখেল্লাধারী বনহুরকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

বনহুর ওকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লো।

কিন্তু আশ্চর্য আলখেল্লাধারী গুলি খেয়েও নির্বিঘ্নে বেরিয়ে গেলো পাশের জানালা দিয়ে। বনহুর আরও অবাক হলো পিস্তল দুটি শব্দহীন পিস্তল। গুলি ছুড়লেও কোন আওয়্যাজ হলো না।

লোকটা পালিয়ে যাবার পর দেখতে পেলো মেঝেতে পড়ে আছে একটা ছোট্ট নেমকার্ড। বনহুর হাতের পিস্তল দুটো ছুঁড়ে-দিলো টেবিলের দিকে তারপর নেমকার্ডখানা হাতে তুলে নিলো সঙ্গে সঙ্গে ভ্রু জোড়া কুঁচ্‌কে গেলো। দেখলো কার্ডে লেখা আছে "যমদূত" বনহুর অট্ট হাসিতে ভেংগে পড়লো— হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ........

এমন সময় পিছনে এসে দাঁড়ায় শাম্মী—মিঃ লিয়ন!

বনহুর শাম্মীর কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলো না বা বিস্মিত হলোনা, আলগোছে ফিরে দাঁড়িয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো—তুমি!

হাঁ।

কিন্তু এ সময়ে তোমাকে আশা করিনি শাম্মী।

অমন করে হাসছিলেন কেনো?

যমদূত!

যমদূত?

হাঁ এইমাত্র যমদূত এসেছিলো এখানে।

যমদূত এসেছিলো এখানে বলেন মিঃ লিয়ন?

হাঁ। হাতে কার্ডখানা বাড়িয়ে ধরলো শাম্মী সম্মুখে—এই দেখো।

কার্ডখানায় চোখ পড়তেই শাম্মীর মুখমণ্ডল অন্ধকার হয়ে গেলো।

বনহুর তীক্ষ্ণদৃষ্টি ফেললো শাম্মীর মুখে। বুঝতে পারলো শাম্মী যেন এ নামের সঙ্গে পরিচিত এবং এ নামটা তাকে যেন মুহূর্তে ভীত আশঙ্কিত করে তুলেছে। বললো বনহুর—তুমি একে চোনো শাম্মী?

শাম্মী সঙ্গে সঙ্গে নিজের মুখোভাব সামলে নিয়ে বললো—না মোটেইনা। আমি ও নাম চিনিনা।

বনহুর কার্ডখানা পকেটে রাখতে রাখতে বললো-তোমার মুখোভাবেই বলে দিচ্ছে তুমি এ নামের সঙ্গে পরিচিত আছো।

বিশ্বাস করুন মিঃ লিয়ন আমি তাকে মানে তাকে চিনিনা। আমতা আমতা করে কথাটা শেষ করে শাম্মী।

বনহুর পকেট থেকে সিগারেট বের করে অগ্নিসংযোগ করে বলে-বসো শাম্মী। কথাটা বলে সে নিজে একটা সোফায় বসে পড়ে।

বনহুরের কথামত শাম্মী বসলো।

রাশিকৃত ধোয়ার ফাঁকে তাকালো বনহুর শাম্মীর মুখের দিকে। সে দেখলো শাম্মীর সুন্দর মুখমণ্ডলে বিন্দু-বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে। ভিতরে ভিতরে সে বেশ উত্তেজনা বোধ করছে, এটা বোঝা গেলো তার মুখো ভাবে।

বনহুর বললো-শাম্মী তুমি আমাকে ভালবাসো আর ভালবাসো বলেই আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছো। তোমার সহায়তা না পেলে হয়তো আমি বাঙ্গালী বন্দী উদ্ধারে এতোটা সাফল্য লাভ করতে পারতামনা।

সেজন্য আমি নিজেও অত্যন্ত আনন্দিত মিঃ লিয়ন। শাম্মী শান্ত গলায় কথাটা বললো।

ঠিক্ ঐ সময় ক্যাবিনে প্রবেশ করলো রহমান। রহমানের শরীরে ড্রাইভারের পোশাক। সেলুট করে দাঁড়ালো সে।

বনহুর আসন ত্যাগ করে সরে এলো রহমানের পাশে, বললো–ঠিক্ মত তারা পৌঁছে গেছে তো?

হাঁ তারা ঠিক মত পৌঁছে গেছে, আমি সেই সংবাদ জানাতেই এলাম।

জাহাজখানা ফিরে আসতে ক'দিন লাগবে?

কাল সন্ধ্যায় পৌঁছে যাবে বলে মনে হচ্ছে। আমি প্লেনে এসেছি তাই বিলম্ব হয়নি।

বেশ ভাল করেছো।

আরও একটা সংবাদ আছে সর্দার।

বলো?

করাচী শহরের দক্ষিণে হিম্সাফিরু নাকম এক স্থানের কোন এক দুর্গম জায়গায় ভূগর্ভে প্রায় কয়েকশত মহিলা ও শিশুকে আটক করে রাখা হয়েছে।

বনহুর একটা শব্দ করলো–হুঁ। একটু থেমে বললো–গাদান বন্দরে এখনও বহু বাঙ্গালী বন্দী অবস্থায় অহরহঃ অসহ্য নির্যাতন ভোগ করছে। তারপর শিয়ালকোটে কয়েকটি বন্দী শিবিরে অনেক অসহায় নারী পুরুষ মৃত্যুর প্রহর গুনছে......থামলো বনহুর, তার মুখোভাবে গভীর এক চিন্তার ছাপ ফুটে উঠলো। বললো আবার–এরা যতদিন না মুক্ত হয়েছে ততদিন আমার শান্তি নাই। হাঁ আর একজন আমার চলার পথে বাধার সৃষ্টি করবার জন্য আবির্ভূত হয়েছে সে হলো যমদূত।

সর্দার।

হাঁ যমদূত। এখন তুমি যাও রামসিংকে জানিয়ে দাও জাহাজ এলে সঙ্গে সঙ্গে সে যেন প্রস্তুতি নেয়।

আচ্ছা সর্দার। কিন্তু......

বুঝেছি যমদূতের কথাটা না শোনা অবধি তুমি শান্তি পাচ্ছোনা। পরে সব বলবো এখন তুমি যাও তোমার কাজ করোগে।

বেরিয়ে যায় রহমান।

বনহুর ফিরে আসে শাম্মীর পাশে। সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে আপন মনে কয়েকবার ধুয়ো ছেড়ে বলে—শাম্মী তোমাকে বড্ড বিমর্ষ লাগছে। জানিনা হঠাৎ তোমার মধ্যে এমন একটা পরিবর্তন এলো কি করে?

শাম্মীর ঠোঁট দু'খানা কেঁপে উঠলো কিছু বলতে চেষ্টা করে থেমে গেলো।

বনহুর শাম্মীর হাতখানা মুঠায় তুলে নিয়ে কোমল কণ্ঠে বললো—তুমি মিছামিছি চিন্তিত হচ্ছো শাম্মী যমদূতের আয়ু ফুরিয়ে এসেছে কাজেই সে এসেছিলো আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। হাঁ তুমি না বললেও জানি যমদূতকে এবং কি তার পরিচয়।

মিঃ লিয়ন।

হাঁ শাম্মী। এবার বনহুর শাম্মীর হাতখানা মুক্ত করে উঠে দাঁড়ালো। পুনরায় আর একটি চুরুটে অগ্নি সংযোগ করে আপন মনে কিছুক্ষণ পায়চারী করলো। তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো বনহুর–শাম্মী একটা নাচ দেখাও।

অবাক কণ্ঠে বললো শাম্মী–নাচ!

হাঁ, বড় আনন্দ লাগছে এতো সহজে আজ যমদূতকে নাগালের মধ্যে পেয়েছিলাম। নাচো–নাচো শাম্মী......

শাম্মী নীরব।

বনহুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো ওর মুখে। গভীরভাবে তাকিয়ে দেখতে চায় ওর ভিতরটা।

শাম্মী দেখলো মিঃ লিয়েনের চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। সে পারলোনা কোন রকম আপত্তি করতে, মন্ত্র মুগ্ধের মত উঠে দাঁড়ালো শাম্মী, তারপর নাচতে আরম্ভ করলো।

বনহুর বসে পড়লো সোফায়।

ক্যাবিনের ফিকে গোলাপী আলোকছটায় শাম্মীর সুন্দর দেহ অপূর্ব লাগছিলো।

বনহুর আপন মনে চুরুট থেকে ধূম্রনির্গত করে চলছিলো মনে মনে ভাবছিলো সেই যমদূতটির কথা।

এক সময় নাচ শেষ হলো শাম্মীর; রীতিমত ঘেমে উঠেছে সে। তার গোলাপী গণ্ডদ্বয় রক্তাভ দেখাচ্ছে। শাম্মী বনহুরের সোফার হাতলে বসে পড়লো আলগোছে।

বনহুর হাতের অর্দ্ধদগ্ধ চুরুটটা সম্মুখের ত্রিপয়ার উপরে রাখা এ্যাসট্রের মধ্যে গুজে রেখে সোজা হয়ে বসলো। ডাকলো—শাম্মী।

শাম্মী আঁচল দিয়ে গলার ঘাম মুছতে মুছতে বললো–বলুন মিঃ লিয়ন?

অদ্ভুত নেচেছো আজ? অপূর্ব......

সত্যি?

হাঁ শাম্মী। আরও অনেক দিন তোমার নাচ দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, কিন্তু এমন করে ভাল লাগেনি। শাম্মী তুমি কোনদিন আমার কাছে কিছু চাওনি। আজ যদি তোমাকে একটি পুরস্কার দেই......

আনন্দিত মনে গ্রহণ করবো মিঃ লিয়ন?

শাম্মী এটা নাও। বনহুর নিজের আংগুল থেকে একটি বহু মূল্যবান হীরক খচিত অংগুরি খুলে নিয়ে বাড়িয়ে ধরলো–নাও।

শাম্মী দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে তাকালো বনহুরের দিকে। কক্ষের ফিকে গোলাপী আলোক ছটায় অংগুরীর পাথরখানা জ্বলছিলো। শাম্মী সহসা হাত বাড়াতে পারলো না।

বনহুর ওর হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিয়ে অংগুরীটা যত্ন সহকারে পরিয়ে দিলো! অবাক হয়ে গেলো বনহুর ওর চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে। দেখলো শাম্মীর গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুধারা।

বনহুর আংগুল দিয়ে ওর গণ্ড থেকে অশ্রুরেখা মুছে দিয়ে বললো–শাম্মী তুমি আমাকে যে সহায়তা করেছো এ তারই পুরস্কার।

শাম্মী হঠাৎ বনহুরের বুকে মুখ গুঁজে বলে উঠলো–মিঃ লিয়ন, আপনার এ পুরস্কার আমার জীবন মরণের সাথী হয়ে আমার সঙ্গে থাকবে! কথা শেষ করেই শাম্মী ছুটে বেরিয়ে গেলো বনহুরের ক্যাবিন থেকে।

বনহুর আপন মনেই একটু হাসলো। মনে মনে ভাবলো শাম্মীর কথাগুলো সত্যি বড় সুন্দর। এবার বনহুর পকেট থেকে বের করলো কার্ডখানা, চোখের সামনে মেলে ধরলো তাতে স্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে যমদূত।

এবার বনহুর শয্যায় এসে বসলো।

ঐ সময় বয় খাবার নিয়ে ক্যাবিনে প্রবেশ করলো।

বনহুর বললো–টেবিলে খাবার রেখে তুমি চলে যাও। এখন ক্ষুধা নাই পরে খাবো।

বয় বেরিয়ে গেলো।

বনহুর শয্যায় চীৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলো অনেক কথা।

❑

হঠাৎ ঘুম ভেংগে গেলো বনহুরের, টেবিলে ফোনটা স্বশব্দে বেজে চলেছে। বনহুর একটু কাৎ হয়ে টেবিল থেকে রিসিভার হাতে উঠিয়ে নিলো–হ্যালো......

সঙ্গে সঙ্গে ও পাশ থেকে ভেসে এলো একটা গম্ভীর ভারী গলার আওয়াজ– মিঃ লিয়ন তোমার প্রেয়সী চিরতরে বিদায় নিয়ে চলে গেছে এবার তোমার যেতে হবে....... ..

বনহুর শেষ পর্যন্ত শুনবার জন্য রিসিভার ধরে রইল কিন্তু ওপাশে রিসিভার রাখবার পূর্বে আরও একটি কথা উচ্চারিত হলো.... যমদূত...

বনহুর রিসিভার রাখতেই দরজায় শব্দ হলো– দরজা খুলুন। দরজা খুলুন...

বনহুর দরজা খুলে দিতেই একটি বয় দমকা হাওয়ার মত ক্যাবিনে প্রবেশ করলো। বেশ হাঁপাচ্ছে সে।

বনহুর বললো– কি হয়েছে বয়?

বয় বলে উঠলো– খুন!

বনহুর অবাক কণ্ঠে বললো– খুন!

হ্যাঁ স্যার মিস শাম্মী খুন হয়েছে।

মুহূর্তে যেন বনহুরের ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। বয়কে সে দু'হাতে কঠিনভাবে চেপে ধরে বললো– মিস শাম্মী খুন হয়েছে বলো কি?

হ্যাঁ স্যার সত্যি মিস্ শাম্মী তার নিজের ক্যাবিনে শয্যায় শায়িত অবস্থায় খুন হয়েছে ....

কোথায় চলো আমি দেখতে চাই?

বয় বললো– তার ক্যাবিনেই তাকে দেখতে পাবেন।

বনহুর বয়কে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে পথ মুক্ত করে নিয়ে বেরিয়ে গেলো।

শাম্মীর ক্যাবিনের সম্মুখে বেশ ভীড় জমে উঠেছে। সকলের মুখেই একটা ভীত আতঙ্কিত ভাব ফুটে উঠেছে।

বনহুর ভীড় ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করলো। ভিতরে প্রবেশ করে দেখতে পেলো একদল ভদ্র লোক শাম্মীর চার পাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। বনহুরকে এগুতে দেখে অনেকে সরে জায়গা করে দিলো।

বনহুর শাম্মীর শয্যার পাশে এসে দাঁড়াতেই বিস্মিত দৃষ্টি মেলে দেখলো, নীরবে ঘুমিয়ে আছে শাম্মী। চোখের পাতা দুটি অর্ধ মেলিত, রক্তাভ গণ্ড কেমন যেন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। ললাটে কতকগুলো কোঁকড়ানো চুল এলোমেলো বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে আছে। বাতাসে চুলগুলো উড়ছে। ঠোঁট দু'খানা এখনও লিপষ্টিকে রঞ্জিত। বনহুরের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো ওর বুকে, সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠলো, মুখোভাব ব্যথা করুণ হলো তার। একখানা সূতীক্ষ্ণ ছোরা বিদ্ধ হয়ে আছে তার ঠিক্ মাঝখানে। চাপ চাপ রক্ত জমাট বেধে আছে বিছানার উপর।

বনহুরের চোখ দু'টো নিজের অজান্তে ঝাপসা হয়ে এলো বাম পাশের দাঁতগুলো দিয়ে অধর দংশন করলো বনহুর। এমন সময় তার নজর পড়লো শাম্মীর পাশে বিছানার উপর। দেখলো ছোট্ট একটি কার্ড পড়ে আছে সেখানে।

বনহুর কার্ডখানা তুলে নিলো হাতে, কার্ডখানায় দৃষ্টি পড়তেই দেখলো সেই পরিচিত দুটি শব্দ"যমদূত"।

ঠিক্ ঐ মুহূর্তে কয়েকজন পুলিশ সহ হোটেল গুলবাগের মালিক স্বয়ং এসে উপস্থিত হলেন।

বনহুরও অন্যান্যদের সঙ্গে সরে দাঁড়ালো।

মালিক প্রায় কেঁদে ফেলে বললেন–ইন্সপেক্টর দেখুন আমার কি সর্বনাশ হয়ে গেছে। মিস শাম্মী ছিলো হোটেল গুলবাগের প্রাণ। আজ থেকে গুলবাগ আমার প্রাণশূণ্য হয়ে পড়লো।

পুলিশ ইন্সপেক্টর নম্র বিনীত গলায় বললেন,–সত্যি মিঃ প্রিন্স আমরাও এজন্য দুঃখিত হচ্ছি, কিন্তু কিছু করবার উপায় নাই।

হোটেল গুলবাগের মালিক বড় সাহেবকে লাহোরের লোকে প্রিন্স বলেই ডাকতো বা জানতো কারণ লাহোরে তার মত ধন কুবেরু কমই ছিলো। প্রিন্স বলে ডাকলেও বড় সাহেবের চেহারা প্রিন্সের মত ছিলোনা বরং তাকে কিংকং মানে গরিলা মহারাজ বললেও ভুল বলা হবে না। মিঃ প্রিন্স যেন কেঁদেই ফেললেন।

পুলিশ ইন্সপেক্টর ততক্ষণে শাম্মীর মৃত দেহটা পরীক্ষা করে দেখছেন। আরও দু'জন পুলিশ অফিসার তাদের সঙ্গে রয়েছে। শাম্মীর বুক থেকে সূতীক্ষ্ণ ছোরাখানা তুলে নিলেন ইন্সপেক্টর পরীক্ষা করে দেখলেন মনোযোগ সহকারে।

পুলিশ অফিসারদ্বয় ডায়রী করে চলেছেন।

বনহুর কিন্তু কার্ডখানা পূর্বেই পকেটে রেখে দিয়ে ছিলো কাজেই কার্ডখানার কথা পুলিশ ইন্সপেক্টার এবং তার সঙ্গীগণ জানলেন না।

পুলিশ অফিসারগণ শাম্মীর লাশ মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে চলে গেলেন। ছোরাখানা পুলিশের লোক সঙ্গে নিয়ে গেলেন একখানা রুমালে জড়িয়ে এবং কাগজে প্যাকেট করে নিয়ে।

মিঃ প্রিন্সও হোটেল থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। যাবার সময় বার বার রুমালে চোখ মুছলেন তিনি। হোটেল গুলবাগের মালিক হলেও তিনি বড় বেশি এখানে আসেন না। কাজেই হোটেলে মালিকের পদাপর্ণ হওয়ায় হোটেলের সবাই তাকে ঘিরে দেখতে লাগলো। বয়স যদিও বেশি তবু বলিষ্ঠ জোয়ান দেহ। দু'চোখে ঘোলাটে ভাব এখনও ফুটে উঠেনি। ঠোঁটের ফাঁকে দামী চুরুট সর্বক্ষণ ধরা থাকে বলে ঠোঁট দু'টো বেশ কালো মনে হয়।

শাম্মীর মৃত্যুতে সমস্ত হোটেলে একটা গভীর শোকের ছায়া নেমে এলো। সে যেন গোটা হোটেলটাকে সদা মুখর করে রাখতো। মিঃ প্রিন্স বলেছিলেন শাম্মী হোটেল গুলবাগের প্রাণ এ কথা যেন সম্পূর্ণ সত্য।

শাম্মীর মৃত্যু বনহুরকেও ব্যথিত করে তুললো। সে তাকে অনেক সহায়তা করেছে। তার সাহায্যে বনহুর বহু বাঙ্গালী নারী পুরুষকে বন্দী শিবির থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। এজন্য বনহুর শাম্মীর কাছে কৃতজ্ঞ।

বনহুর আপন মনে ধূমপান করে চলেছে, মাথার মধ্যে নানা রকম চিন্তা জাল ঘুর পাক খাচ্ছিলো। এমন সময় বয় এসে টেবিলে খাবার রেখে গেলো।

বনহুর হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো, রাত এখন সাড়ে নয়টা। এবার বনহুর উঠে খাবার টেবিলে এসে বসলো প্লেটখানা সম্মুখে টেনে নিয়ে কাটা চামচগুলো হাতে তুলে নিলো। তারপর অন্যান্য দিনের মত খাবার প্লেটে নিয়ে যেমন মুখে তুলতে যাবে অমনি সে শুনতে পেলো শাম্মীর কণ্ঠস্বর........না না ওগুলো আপনি খাবেন না মিঃ লিয়ন........

বনহুর চমকে মুখ তুললো......তুমি–তুমি বেঁচে আছো শাম্মী?

কিন্তু শাম্মী কোথায়, কেউ নেই চারপাশে তাকিয়ে হতাশ হলো বনহুর। খাবার টেবিলে বসে তাকিয়ে রইলো সম্মুখস্থ খাবারগুলোর দিকে। কে-কে তাকে এমন করে বারণ করলো, তবে কি শাম্মীর গলা ওটা নয়। বনহুর যে স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে শাম্মীর সেই মিষ্টি কণ্ঠস্বর। তবে কি ওটা মনের খেয়াল। হয়েতো তাই হবে না হলে শাম্মী আসবে কোথা থেকে। সম্মুখের টেবিলে খাবার পড়ে রইলো উঠে পড়লো বনহুর।

আলগোছে এসে শয্যায় শুয়ে পড়লো। কিন্তু সে শোবার সময় ক্যাবিনের দরজাটা আপন ইচ্ছায় খুলে রাখলো।

অল্পক্ষণেই অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লো বনহুর।

রাত বাড়ছে।

সমস্ত লাহোর শহর সুপ্তির কোলে ঢলে পড়েছে। রাজপথ এখন জনশূন্য নির্জন নিস্তব্ধ। রাজপথের দু'পাশে দোকানগুলির সাইন বোর্ডে বিজলী বাতিগুলো জ্বলছে আর নিভছে। মাঝে মাঝে দু' একটা গাড়ি এদিক থেকে সেদিকে চলে যাচ্ছে। ফুটপাতের উপর কোথাও কোথাও কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছে ভিখারীর দল।

আকাশে তারার মালা অসংখ্য জোনাকীর মত পিট পিট করে জ্বলছে।

লাহোর গুলবাগ হোটেলের আলোগুলো অটোমেটিক জ্বলছে আর নিভছে। এমন সময় সাদা ধপ্ ধপে আলখেল্লায় সমস্ত দেহ আবৃত একটা দেহ সোজা এসে দাঁড়ালো পাঁচ তলায় এক নম্বর ক্যাবিনের সম্মুখে।

দরজায় মৃদু চাপ দিতেই দরজা খুলে গেলো ভিতরে প্রবেশ করলো আলখেল্লাধারী। মরা লাশের মত এগিয়ে যাচ্ছে সে মেঝের দিকে।

ও পাশের খাটে আপাদমস্তক গোলাপী চাদরে ঢাকা শুয়ে আছে বনহুর। গভীর নিদ্রায় অচেতন সে। সাদা ধপ্ ধপে আলখেল্লা পরা লোকটা বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো, দক্ষিণ হাতখানা তার বেরিয়ে এলো আলখেল্লার ভিতর থেকে। কক্ষের গোলাপী আলোতে তার হাতে একখানা সূতীক্ষ্ণ ছোরা ঝক মক করে উঠলো। আলখেল্লাধারী এবার তার হস্তস্থিত ছোরাখানা সমূলে বসিয়ে দিলো শয্যা শায়ীত বনহুরের বুকে।

ছোরাখানা বসিয়ে দিয়েই আলখেল্লাধারী দ্রুত বেরিয়ে গেলো ক্যাবিন থেকে। যাবার সময় ক্যাবিনের দরজা ভালভাবে বন্ধ করে দিয়ে গেলো সে।

পরদিন সমস্ত হোটেলে আতঙ্কের ছায়া পড়লো মিঃ লিয়নকে কে বা কারা হত্যা করেছে। তার বিছানায় চাপ চাপ রক্ত জমাট বেঁধে আছে কিন্তু লাশ পাওয়া গেলোনা। পুলিশ এলো অনেক তদন্ত করলো কিন্তু এর কোন হদিস খুঁজে পেলোনা কেউ।

আজও হন্ত দন্ত হয়ে ছুটে এলেন হোটেলের মালিক বড় সাহেব মিঃ প্রিন্স। তিনি ভীত উৎকণ্ঠিতভাবে বললেন–একি কান্ড শুরু হলো আমার হোটেল গুলবাগে। কার নিহত হলো আমার প্রিয় মিস শাম্মী আর আজ নিহত হলেন মিঃ লিয়ন। সব যেন কেমন ঘোলাটে লাগছে। আরও ঘোলাটে রহস্যজনক মনে হচ্ছে মিঃ লিয়নের লাশ অন্তর্ধান হওয়াটা........

পুলিশ সুপার আজ স্বয়ং এসেছেন তিনি "ক্লু" আবিষ্কারের মনোযোগ দিলেন। বিছানার পাশে পেলেন রক্তমাখা একখানা ছোরা আর একটি ছোট্ট চিঠি। চিঠিখানা হাতে তুলে নিলেন পুলিশ সুপার এবং পরে দেখলেন তাতে লিখা আছে–

মিঃ লিয়নের লাশ নিয়ে গেলাম যমদূত চিঠি ও ছোরাখানা যত্ন সহকারে নিলেন তিনি পরীক্ষা করার জন্য।

মিঃ লিয়নের কক্ষে যখন ভীড় করে মিঃ লিয়নের হত্যা রহস্য নিয়ে পুলিশ মহল এবং হোটেলের কর্মকর্তাগণ ব্যতি ব্যস্ত তখন ক্যাবিনে প্রবেশ করে রহমান। আজও তার শরীরে ড্রাইভারের ড্রেস, এসেছে সে তার সর্দারের সঙ্গে দেখা করতে।

ক্যাবিনে প্রবেশ করেই রহমান হক চকিয়ে যায়। প্রথমে সে কিছু বুঝতেই পারে না কিন্তু এটুকু বুঝতে পারে নিশ্চয়ই কোন একটা কিছু ঘটেছে। শয্যার দিকে তাকাতেই শিউরে উঠে সে, বিছানায় চাপ চাপ রক্ত জমাট বেঁধে আছে।

রহমানকে দেখেই পাশের ক্যাবিনের ভদ্রলোক বললেন–মিঃ লিয়ন খুন হয়েছে।

রহমান অস্ফুট কণ্ঠে বললো—মিঃ লিয়ন খুন হয়েছে বলেন কি?

হাঁ দেখছেন না ব্যাপার........

বিছানায় রক্ত দেখছি লাশ–লাশ কোথায়? রহমান ব্যস্ত গলায় বললো।

পাশের ক্যাবিনের ভদ্রলোক বললেন–লাশ উধাও। কে বা কারা মিঃ লিয়নের মৃতদেহ নিয়ে গেছে।

রহমান আর পাশের ক্যাবিনের ভদ্রলোকটি যখন কথা হচ্ছিলো তখন মিঃ প্রিন্স লক্ষ করেছিলেন তিনি এগিয়ে এসে প্রায় কাঁদো কাঁদো স্বরে বললেন–পর পর এমন দুর্ঘটনার জন্য আমি বড় মর্মাহত জানিনা কে সে খুনী যে হোটেল গুলবাগে আতঙ্ক সৃষ্টি করে চলেছে। সে যেই হোক আমি তাকে দেখে নেবোই। পুলিশ সুপার আপনি দয়া করে আমাকে এ চিন্তা থেকে উদ্ধার করুন। হত্যাকারীকে খুঁজে বের করা আমার পক্ষে কষ্টকর হবে না। কিন্তু......কিন্তু লাশ গেলো কোথায়? শেষের কথাটা আপন মনে বললো মিঃ প্রিন্স।

ঠিক্ ঐ সময় এগিয়ে এলো হোটেল গুলবাগের বৃদ্ধ বয় ইয়াসিন মিয়া। মালিক মিঃ প্রিন্সের শেষের কথাটা কানে গিয়েছিলো তার। বললো– স্যার লাশটা ঠিক ভূত হয়ে গেছে। শুনেছি অমাবস্যা রাতে কোন মানুষ খুন হলে সে ভূত হয়।

সেদিন তেমন আর কোন কথা হয় না কারো মধ্যে সবাই বিদায় গ্রহণ করে এক নম্বর ক্যাবিন থেকে। ক্যাবিনটা তালা বন্ধ করে রাখা হলো।

রহমানের চোখেমুখে বিষাদের ছায়া নেমে এসেছে। সে যেন বিশ্বাসই করতে পারছেনা তার সর্দার খুন হয়েছে। তবে তার লাশ গেলো কোথায়! রহমান চিন্তা ক্লিষ্ট মনে লিফ্টের দরজায় এসে দাঁড়ালো।

ঠিক্ ঐ মুহূর্তে একটা ছোট্ট কাগজের মোড়ক এসে পড়লো তার সম্মুখে।

উবু হয়ে রহমান মোড়কটা তুলে নিলো হাতে। মোড়কটা মেলে ধরতেই চোখ দুটো তার উজ্জ্বল দ্বীপ্ত হয়ে উঠলো। কাগজের মোড়কে লিখা আছে দুটি কথা–

রহমান আমি যে ভাবে তোমাদের নির্দেশ দিয়েছি ঐ ভাবে কাজ করে যাবে। আমি হোটেল গুলবাগেই আছি।

–দস্যু বনহুর

রহমান কাগজের মোড়কখানা দ্রুত হস্তে পকেটে রেখে লিফ্টে এসে দাঁড়ালো। একটু পূর্বে তাকে অত্যন্ত বিষণ্ন মলিন এবং চিন্তা যুক্ত দেখাচ্ছিলো এক্ষণে তাকে প্রফুল্ল আনন্দ মুখর লাগছে।

হোটেল গুলবাগ থেকে নিচে নেমে এলো রহমান। গাড়িখানা পাশে এসে দাড়ালো।

ঐ সময় মিঃ প্রিন্স তার দু'জন সঙ্গী সহ গাড়িতে উঠে বসলো। গাড়িখানা বেরিয়ে গেলো হোটেল গুলবাগের সম্মুখ থেকে।

❑

নিস্তব্ধ রাত।

নির্জন কক্ষ। হোটেল গুলবাগের মালিক বড় সাহেব মিঃ প্রিন্স এর কক্ষ এটা। উজ্জ্বল আলো জ্বলছে, একটা টেবিলের পাশে বসে কোন হিসাব নিকাশ করছে। মাঝে মাঝে রিসিভার তুলে নিয়ে কারও সঙ্গে কথাবার্তাও চলছে।

এক সময় হিসাব নিকাশ শেষ হয়ে যায় ও ফাইলটা গুছিয়ে রেখে রিসিভার তুলে নেয় হাতে। সঙ্গে সঙ্গে ওপাশ থেকে ভেসে আসে একটি গম্ভীর কঠিন কণ্ঠস্বর......মিঃ প্রিন্স আজ রাত চারটায় আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসছি। আপনার বন্দী শালায় কতগুলি বাঙ্গালী নারী পুরুষ আছে তার হিসাব চাই বন্দীশালার চাবি........

......এ্যাঁ এ্যাঁ......আপনি কে......কে......বলছেন......

ওপাশ থেকে ভেসে এলো......মিঃ লিয়নের প্রেত-আত্মা কথা বলছি......সাবধান এ কথা কাউকে বললে আপনার লাশ ঝুলবে আপনার কক্ষের কড়িডোরে। ......

মিঃ প্রিন্স এর মুখে একটা কুৎসিৎ হাসি ফুটে উঠলো হেসে উঠলো–মিঃ লিয়নের প্রেত আত্মা......হাঃ হাঃ হাঃ...আপন মনে হেসে উঠলো হোটেল গুলবাগের মালিক মিঃ প্রিন্স সাহেব।

এবার প্রিন্স উঠে দাঁড়ালো। বিছানার তলা থেকে বের করলো একটা অদ্ভুত ধরনের যন্ত্র। যন্ত্রটা দেয়ালের ইলেকট্রিক সুইচের সঙ্গে আটকে দিলো সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কক্ষটার দেয়ালে ইলেকট্রিক কারেন্ট সংযোগ হয়ে গেলো। এক্ষণে যে কোন ব্যক্তি এ কক্ষে প্রবেশের চেষ্টা করবে সেই মৃত্যুমুখে পতিত হবে। যতক্ষণ দেয়ালে ইলেট্রিক কারেন্ট সংযোগ থাকবে ততক্ষণ দেয়ালের একস্থানে দু'টো লাল বাল্ব জ্বলছে আর নিভছে। যেন দুটো অগ্নি চক্ষু পিট পিট করে তাকাচ্ছে।

মিঃ প্রিন্স হাস্যউজ্জ্বল মুখে শয্যায় এসে বসে। দেয়াল ঘড়িটা তখন তিনটা ঘোষণা করলো। কিন্তু বেশিক্ষণ শয্যায় বসে বা শুয়ে থাকতে পারলোনা মিঃ প্রিন্স একটা অস্বতি তাকে চঞ্চল করে তুললো। মেঝেতে পায়চারী করছে আর বার বার তাকাচ্ছে দেয়াল ঘড়িটার দিকে। যতক্ষণ না চারটা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে ততক্ষণ সে নিশ্চিন্ত নয়।

একটু শব্দ হলেই চমকে উঠছিলো মিঃ প্রিন্স সাহেব। কেমন যেন একটা ভীত-ভাব আচ্ছন্ন করে ফেলছিলো তাকে। মুখমণ্ডলে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে। দেয়াল ঘড়ি রাত সাড়ে তিনটা ঘোষণা করলো।

মিঃ প্রিন্স হঠাৎ পায়চারী বন্ধ করে লৌহসিন্দুক খুলে বের করলো একটা স্বর্ণখচিত সুন্দর কৌটা কৌটাখানা সে অতি যত্নে লুকিয়ে রাখলো দেয়ালের ভিতরে একটি গোপন জায়গায়। দেয়ালটা একটু ফাঁক হয়ে আবার বন্ধ হয়ে গেলো। যেমন পূর্বে ছিলো ঠিক্ তেমনি ভাবে। যখন মিঃ প্রিন্স দেয়ালে স্বর্ণকৌটা লুকিয়ে রাখছিলো তখন দেয়ালের গায়ে কারেন্ট সুইচ্ অফ করে দিয়েছিলো সে। কৌটা লুকিয়ে রাখার পরপরই পুনরায় সুইচ অফ করে দিলো সঙ্গে সঙ্গে লাল আলোর বাল্ব দুটো জ্বলতে আর নিভতে শুরু করলো।

মিঃ প্রিন্স ফিরে তাকাতেই একটা ছায়ামূর্তি আলগোছে তার পিছনে এসে দাঁড়ালো। পিঠে একটা কঠিন পদার্থের ছোয়া অনুভব করলো সে। তৎক্ষণাৎ ঘুরে দাঁড়ালো, একটু শব্দ করে উঠলো-কে?

আমি মিঃ লিয়নের প্রেতআত্মা। বললো ছায়ামূর্তি।

মুহূর্তে মুখখানা অমাবস্যার মেঘের মত কালো হয়ে উঠলো। ঢোক গিলে বললো-তুমি তুমিই......

হাঁ আমিই বলেছিলাম রাত চারটায় আসবো সাক্ষাৎ করতে। তাই এসেছি......

মিঃ প্রিন্স তাকালো দেয়াল ঘড়িটার দিকে।

ছায়ামূর্তি বললো-আমি ঠিক্ সময়ই এসেছি মিঃ প্রিন্স। বের করুন এবার আপনার হিসাবের খাতাটা। কতগুলো বাঙ্গালী বন্দী আছে আপনার বন্দীশালায়।

গলায় জোর দিয়ে বলে মিঃ প্রিন্স—নানা আমার কাছে কোন হিসাবের খাতা নেই......কথার ফাঁকে তাকায় সে ছায়ামূর্তির হাতের রিভলভারটার দিকে।

ছায়ামূর্তি এবার মিঃ প্রিন্স—এর গলার টাই চেপে ধরে বজ্র মুষ্ঠিতে, দাঁতে দাঁত পিষে বলে—খাতা বের করুন বলছি এবং বন্দীখানার চাবি দিন।

মিঃ প্রিন্স অবাক হয়ে গেছে সমস্ত দেয়ালে ইলেকট্রিক কারেন্ট থাকা স্বত্বেও এলো কি করে? মনে মনে ভাবতে থাকে আরও ভাবতে থাকে কি করে এর হাত থকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

ছায়ামূর্তি বুঝতে পারে মিঃ প্রিন্স-এর মনোভাব। সে প্রকাশ্য বলে—ভাবছেন কি করে এলাম? আত্মার গতি সর্বত্র এ কথা নিশ্চয়ই জানেন। কাজেই অবাক হবার কোন কথা নয়। আরও একটা কথা মনে রাখবেন—আমার কবল থেকে রেহাই পাবার কোন উপায় নাই। চলুন, বের করুন বন্দীশালার হিসাবের খাতা ও চাবিগোছা।

এবার মিঃ প্রিন্স বাধ্য ছাত্রের মত টেবিলের দিকে অগ্রসর হলো। আলগোছে টেবিলের ড্রয়ার খুলে ফেললো এবং সঙ্গে সঙ্গে একখানা পিস্তল হাতে তুলে নিয়ে ছায়ামূর্তিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লো।

মুহূর্ত-বিলম্ব না করে ছায়ামূর্তি সরে দাঁড়ালো। গুলি গিয়ে বিদ্ধ হলো পিছনের দেয়ালে। সঙ্গে সঙ্গে ছায়ামূর্তি ঝাপিয়ে পড়লো মিঃ প্রিন্সের উপর। কঠিন হাতে চেপে ধরলো মিঃ প্রিন্সের পিস্তল সহ হাতখানা। ভীষণ ধস্তাধস্তি শুরু হলো, প্রিন্সের হাতের পিস্তলখানা ছিট্‌কে পড়লো দূরে। এবার ছায়ামূর্তি প্রিন্সের চুল ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দিলো। বুকে চেপে ধরেছে রিভলভারখানা। দৃঢ় কঠিন কণ্ঠে বললো—বের করো বলছি হিসাবের খাতা! নইলে এক্ষুণি তোমার চোখ দুটো উপড়ে নেবো।

মিঃ প্রিন্সের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়েছে। ঠোঁটের একপাশ কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। চুলগুলো এলোমেলো। ঘেমে নেয়ে উঠেছে সমস্ত দেহটা। এবার মিঃ প্রিন্স বন্দী শিবিরের হিসাবের খাতাখানা বের করে রাখলে তার সঙ্গে বের করলো কয়েকটা চাবির গোছা।

ছায়ামূর্তি দক্ষিণ হস্তে রিভলভার চেপে ধরে রয়েছে মিঃ প্রিন্সের পিঠে এবং বাম হস্তে খাতাখানা মেলে ধরে বলে—বলো কতজন বাঙ্গালী বন্দী রয়েছে তোমার বন্দীশালায়? কতজন নারী এবং কত জন পুরুষ? আর কতগুলো শিশু?

মিঃ প্রিন্স বিরাট শক্তিশালী পুরুষ হলেও ছায়ামূর্তির কাছে ভিজা বিড়াল বনে গেলো। বাধ্য হলো সে তার বন্দী শিবিরের ঠিকানা ও হিসাব জানাতে।

এবার ছায়ামূর্তি বাম হস্তে চাবির গোছা তুলে নিয়ে পকেটে রাখলো তারপর বললো– আজ তোমাকে আমি হত্যা করবোনা কারণ তোমার প্রয়োজন আছে। তবে আজ রাতটা তোমাকে আটক থাকতে হবে।

ছায়ামূর্তি এবার মিঃ প্রিন্স-এর হাত-পা মুখ মজবুত করে বেধে ফেললো একটা সিল্ক কড দিয়ে তারপর বাথরুমের মধ্যে টেনে নিয়ে গেলো আলগোছে। ফিরে এলো ছায়ামূর্তি ইলেট্রিক মেশিনটার সুইচ অফ্ করে দিয়ে বেরিয়ে গেলো সে যে পথে কক্ষে প্রবেশ করেছিলো সেই পিছন জানালা দিয়ে। ও পাশেই ছিলো সিড়ি, বেয়ে নেমে এলো নিচে। অদূরে পথের উপর গাড়ি দাঁড়িয়েছিলো ছায়ামূর্তি গাড়ির দিকে এগুলো।

হঠাৎ প্বাহারারত দারওয়ানের দৃষ্টি গিয়ে পড়ে ছায়ামূর্তির উপর। সঙ্গে সঙ্গে তাদের রাইফেল গর্জে উঠলো, ততক্ষণে ছায়ামূর্তির গাড়িতে উঠে বসেছে।

উল্কা বেগে গাড়িখানা ছুটতে শুরু করলো।

মিঃ প্রিন্সের পাহারারত দারওয়ানগণ সবাই ক্ষিপ্তের মত এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতে লাগলো। কেউ বা ছুটলো মালিকের কামরার দিকে, কেউ বা ছুটলো গাড়ি নিয়ে ছায়ামূর্তির গাড়িখানাকে লক্ষ্য করে। মাঝে মাঝে গর্জে উঠছে পিছনের গাড়ি থেকে রাইফেল আর বন্দুক। কিন্তু সম্মুখস্থ গাড়িখানা ততক্ষণে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে।

শেষ পর্যন্ত বিফল মনরথে ফিরে আসে, হোটেল গুলবাগের মালিক মিঃ প্রিন্সের পাহারাদারগণ। যারা মালিকের কক্ষের দিকে ছুটে গিয়েছিলো তারা হতাশ হয়ে মাথায় করাঘাত করে কারণ তখন মালিককে খুঁজে পায়না ওরা।

তবে অল্পক্ষণেই মালিক মিঃ প্রিন্সকে তার বাথরুমে হাত পা মুখ বাঁধা অবস্থায় গড়াগড়ি দিচ্ছে দেখতে পায়। তার দলবল ব্যস্ত সমস্ত ভাবে মালিকের হাত পা এবং মুখের বাঁধন মুক্ত করে দেয়। মালিক প্রিন্সের দলবল ও কর্মচারীদের কাছে তার ভীষণ একটা শক্তির দম্ভ ছিলো এক্ষণে সব দম্ভ তার সমূলে বিনষ্ট হয়ে যায় মুখ কালো করে বলে–শীগ্গীর যাও বন্দী শিবিরে......সব গেছে......সব গেছে......

কেউ কিছু বুঝতে পারেনা মিঃ প্রিন্স-এর মাথা খারাপ হয়েছে মনে করে তারা। কয়েকজন তাকে ধরে মাথায় পানি ঢালতে শুরু করে।

মিঃ প্রিন্স যতই বলে, সর্বনাশ হয়েছে ততই সবাই মিলে তাকে বুঝিয়ে ক্ষান্ত করতে চেষ্টা করে। ডাক্তার এলো পরীক্ষা করে বললো-ইনি ভীষণ সক্ পেয়েছেন কাজেই এনার মাথায় কিঞ্চিৎ গোলযোগ দেখা দিয়েছে। ডাক্তার আরও বললেন- যে দুস্কৃতিকারী তাকে বন্দী করেছিলো সে সাধারণ লোক নয়, তার অসীম শক্তির কাছে পরাজিত হয়ে মিঃ প্রিন্স এমন হয়ে গেছেন।

এদিকে যখন মিঃ প্রিন্সকে নিয়ে ডাক্তার এবং মিঃ প্রিন্সের আত্মীয় স্বজন ব্যস্ত সমস্ত হয়ে পড়েছে তখন মিঃ প্রিন্সের নিজস্ব বন্দী শিবির থেকে বাঙ্গালী বন্দীদের মুক্ত করে নেওয়া হচ্ছে।

ছায়ামূর্তি বন্দী বাঙ্গালীদের উদ্ধার করে গাড়ি সহ হাবসী ব্রিজের অদূরে থেমে থাকা জাহাজের নিকটে এসে থামলো। ড্রাইভ আসন থেকে নেমে দাঁড়ালো ছায়ামূর্তি।

সঙ্গে সঙ্গে কাওসার আর রামসিং সেলুট করে দাঁড়ালো। তারা রাঙ্গী নদী তীরে অপেক্ষা করছিলো।

ছায়ামূর্তি গাড়ির দরজা নিজ হাতে খুলে দিলো তারপর গম্ভীর গলায় বললো-আপনারা নেমে আসুন।

বন্দী বাঙ্গালীদের চোখে মুখে আনন্দ উচ্ছ্বাস ফুটে উঠেছে যদিও রাতের অন্ধকার মুখমণ্ডল দেখা যাচ্ছেনা তবু বেশ বোঝা যাচ্ছে মুক্তির আনন্দে উচ্ছল তারা। সবাই গাড়ি থেকে নেমে পড়তেই ছায়ামূর্তি বললো-রামসিং এদের সবাইকে জাহাজে উঠিয়ে নাও।

রামসিং ও কাওসার উদ্ধারকৃত বাঙ্গালীদের জাহাজে তুলে নিলো।

ছায়ামূর্তি আবার অন্ধকারে গাড়িতে চেপে বসলো।

❑

গভীর রাত।

একখানা জমকালো গাড়ি এসে থামলো লাহোর হাবহিলা ক্লাবের সম্মুখে। ক্লাব গৃহ এক নীরব নিঝুম। সবাই চলে গেছে যে যার বাড়িতে। শুধু দু'একটি বয় এর কণ্ঠ সোনা যাচ্ছে আর শোনা যাচ্ছে যারা বেশি শরাব পান করে হুস হারিয়ে আবোল তাবোল বকছে তাদের গলা।

গাড়িখানা থামতেই নামলো এক ব্যক্তি। সম্পূর্ণ, শরীর তার চাদরে ঢাকা। লোক চক্ষু এড়িয়ে সে এখানে এসেছে তাতে কোন সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি গাড়ি থেকে নামলো সে অন্য কেহ নয় সে হলো হোটেল গুলবাগের মালিক মিঃ প্রিন্স। হাব্‌হিলা ক্লাব তার অতি প্রিয় স্থান, এখানে সে প্রতি রাত না এলে ঘুমাতে পারেনা।

প্রতি রাতের মত আজও এসেছে মিঃ প্রিন্স। দু'জন রাইফেল ধারী তাকে গার্ড দিয়ে ক্লাবের মধ্যে নিয়ে চললো। এমন সময় আরও একখানা গাড়ি এসে থামলো সেই ক্লাবটির সম্মুখে। গাড়ি থেকে নামলো এক পৌঢ় ভদ্র লোক। মুখে দাঁড়ি, মাথায় একরাশ পাকা চুল। চোখে সবুজ কাঁচের চশমা। প্রৌঢ় ভদ্র লোক এগিয়ে এসে মিঃ প্রিন্সের সঙ্গে করমর্দন করে বললো—শুভ সংবাদ তো মিঃ প্রিন্স।

মিঃ প্রিন্স হেসে বললো—শুভ সংবাদ। তবে আপনি...

ও আমার সঙ্গে আপনার তো পরিচয় হয়নি। চলুন ক্লাবে বসে পরিচয় হবে।

চলুন। বললো মিঃ প্রিন্স।

প্রৌঢ় ভদ্র লোক এবং মিঃ প্রিন্স একই সঙ্গে ক্লাব গৃহে প্রবেশ করলো।

মিঃ প্রিন্সকে ক্লাবের দু'জন বয় অভ্যর্থনা জানিয়ে ভিতরে নিয়ে চললো।

প্রৌঢ় ভদ্র লোকও তার সঙ্গে রইলো।

ক্লাবের মধ্যে প্রবেশ করে একটা টেবিলে গিয়ে পাশা-পাশি বসলো প্রৌঢ় ভদ্র লোক এবং মিঃ প্রিন্স। অল্পক্ষণেই উভয়ে উভয়ের পরিচয় পেয়ে গেলো এমন কি বন্ধুত্ব জমে গেলো। কারণ ক্লাবের প্রধান বাঈজী লছমিয়ার চাচা হলে প্রৌঢ় ভদ্র লোকটি।

মিঃ প্রিন্সের প্রিয়জন হলো লছমিয়া বাঈজী। লছমিয়ার জন্য মিঃ প্রিন্স আজ লাহোরে গুলবাগের মত হোটেলের মালিক হতে পেরেছে। লছমিয়া লাহোরের অতি পুরানো বাঈজী। এমন কোন ব্যক্তি নাই যার সঙ্গে সে পরিচিত নয় বিশেষ করে লাহোরের ধনবান ব্যক্তিদের সঙ্গেই তার বেশি পরিচয়। শুধু লাহোর নয়, সমস্ত পাকিস্তান মিলে তার নাম ডাক আছে দক্ষ বাঈজী হিসাবে। লছমিয়া বাঈজী চাচা যখন এই প্রৌঢ় ব্যক্তি তখন নিশ্চয়ই তাদের দলের মানুষ।

মিঃ প্রিন্স বাঙ্গালী বন্দী তরুণীদের নিয়ে লছমিয়া বাঈজীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ব্যবসা চালিয়ে চলেছে। মিঃ প্রিন্স লছমিয়ার কাছে বহু তরুণী বিক্রি করে লাখ লাখ টাকা উপার্জন করেছে।

লছমিয়া বাঈজী এই সব তরুণীদের পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন লোকের কাছে চালান করে পয়সা উপার্জন করে চলেছে। হাবহিলা ক্লাবে তরুণীদের নিয়ে আসা হতো এবং এখান থেকে পছন্দ মত বেচা কেনা চলতো।

মিঃ প্রিন্স এসেছেন আজ হিসাব নিকাশ করতে। মিঃ প্রিন্স খুশিই হলো বললো–আপনি যখন লছমিয়া বাঈজী চাচা তখন আমিও আপনাকে.....

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই......চাচা বলে ডাকবেন। বললো প্রৌঢ় ভদ্রলোক।

এমন সময় লছমিয়া স্বয়ং হাজির হলো সেখানে। চাচাকে দেখা মাত্র তার গায়ে হাত রেখে কদমবুসি করলো। তারপর কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে বললো–আসুন আপনারা আমার কক্ষে আসুন।

মিঃ প্রিন্স এবং চাচা উঠে লছমিয়াকে অনুসরণ করলো।

হাব্হিলা ক্লাব তেমন খুব বড় না হলেও একেবারে ছোট খাটো নয়। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলো লছমিয়া, লম্বা একটি রুম পেরিয়ে মাঝারী ধরণের একটি রুমে প্রবেশ করলো তারা। রুমটা বেশ পরিপাটি করে সাজালো! এক পাশে একটা গেলাফে ঢাকা চৌকি, চৌকিটার উপরে নানা রকম বাদ্যযন্ত্র থরে থরে সাজানো। কিছু পূর্বেই যে ঐ বাদ্যযন্ত্র গুলো ব্যবহার করা হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নাই। একপাশে কয়েকটা সোফা সেট, মাঝখানে একটা টেবিল, টেবিলে কয়েকটা কাঁচ পাত্র এবং কয়েকটা শূন্য মদের বোতল।

মেঝেতে দামী কার্পেট বিছানো। কতকগুলো ফুলের পাপড়ী মেঝের কার্পেটে ছড়িয়ে পড়ে আছে।

লছমিয়া মিঃ প্রিন্সকে বললো–বসুন মালিক সাহেব। চাচা তুমিও বসো, আমি তোমাদের জন্য কিছু নিয়ে আসতে বলি। চাচা ব্যস্ত কণ্ঠে বললো–না না আমার জন্য কিছু লাগবেনা লছমিয়া মা। তুমি বরং ওনার জন্য কিছু আনতে বলো।

লছমিয়া চলে গেলো একটু পরে ফিরে এলো সে, পিছনে একটা বয়ের হাতে একটি ট্রের উপর একটি মূল্যবান মদের বোতল আর দুটো গেলাস।

লছমিয়া নিজে; বয়ের হাত থেকে ট্রেসহ জিনিসগুলো নামিয়ে টেবিলে রাখলো। লছমিয়াই পরিবেশন করবে বলে কাঁচ পাত্রের দিকে হাত বাড়াতেই চাচা বললো–আহা তুমি কষ্ট করোনা মা আমিই দিচ্ছি। তোমরা কাজের কথা আলাপ করো।

মিঃ প্রিন্স হেসে খুশি ভরা গলায় বললো–লছমিয়া এসো আমরা কাজের কথা নিয়ে আলাপ করি।

প্রৌঢ় চাচা নিজের হাতে মদের বোতল থেকে মদ গেলাসে ঢেলে মিঃ প্রিন্সের দিকে বাড়িয়ে ধরলো।

তখন মিঃ প্রিন্স আর লছমিয়া মিলে কথা বার্তা শুরু হয়ে গেছে। মিঃ প্রিন্স বললো–আমার বন্দী শিবির থেকে বন্দী চুরি হয়ে গেছে শুনেছো লছমিয়া বাঈজী?

হাঁ শুনেছি, কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার এতো সব বন্দী গেলো কোথায়? কে তাদের উধাও করলো?

তুমি সব কথা তাহলে শোননি লছমিয়া।

এবার চাচা জবাব দিলো–লছমিয়া কি করে শুনবে সে তো সব সময় কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে......

মিঃ প্রিন্সের যেন হুস হলো সে বললো–তাইতো তুমি আবার শুনবে কি করে। বলি শোন......একটু থেমে আবার বললো–লছমিয়া বাঈজী তুমি আমার আশা ভরসা সব কিছু, কাজেই তোমার কাছে আমার গোপন করবার কিছু নাই। সেদিন রাতের ঘটনাটা সব খুলে বললো মিঃ প্রিন্স। হোটেল গুলবাগে যে মিঃ লিয়ন নিহত হয়েছিলো, সেই নিহত লিয়নের প্রেতআত্মা এসেছিলো গভীর রাতে তার ঘরে। তার গোপন হিসাবের খাতা এবং বন্দী শিবিরের চাবিসহ সে নিয়ে গিয়েছিলো। কথা শেষ করে বললো মিঃ প্রিন্স–লছমিয়া মিঃ লিয়নের প্রেতআত্মা আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলো এ কথা আমি যেন কাউকে না বলি। বললে আমার লাশ আমার শয়ন কক্ষের করিডোরে ঝুলবে।

লছমিয়া বললো–আমাকে বললেন এ কথা কেউ জানবেনা। চাচা তুমিও যেন কাউকে বলোনা।

চাচা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললো–না-না আমি মরে গেলেও আমার মুখ থেকে এসব গোপন কথা বের হবেনা। কথাটা বলার ফাঁকে আরও এক গেলাস সারাব ঢেলে মিঃ প্রিন্স এর হাতে দেয় সে।

লছমিয়ার মুখ কালো হয়ে উঠেছে, এবার সে ভাঙ্গা নিরাশ গলায় বললো—মালিক আপনার বন্দী শিবির থেকে মাল চালান করে বেঁচে আছি আর এ সর্বনাশ হলো। কপালে করাঘাত করলো লছমিয়া বাঈজী।

মিঃ প্রিন্স হাতের কাঁচপাত্র শূন্য করে সম্মুখের টেবিল রেখে মৃদু হেসে বললো—লছমিয়া তুমি যদি না বাঁচো তা হলে আমিই বাঁচবো কি করে। মিঃ প্রিন্স একেবারে বোকা নয়।

অবাক কণ্ঠে বললো বৃদ্ধ চাচা—সত্যি বড় সাহেব আপনাকে লছমিয়া বড় বোকা ঠাওরাচ্ছে। আপনি হলেন শিয়ালের মত ধূর্ত কিনা........

কি—কি বললেন ওস্তাদজী? বললো মিঃ প্রিন্স।

ওস্তাদজী চাচা তাড়াতাড়ি নিজকে সামলে নিয়ে বললো—নানা আপনি কেনো মানে, মানে ঐ যে মিঃ লিয়নের প্রেতআত্মা, যে গভীর রাতে আপনার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে........যাই বলুন বড় সাহেব আপনাকে ঠকাবে এমন লোক এ দুনিয়ায় নেই।

হাঁ ঠিক বলছেন ওস্তাদজী চাচা। মিঃ লিয়নের প্রেতআত্মাই হোক আর যেই হোক আমাকে ঠকাতে পারবে না।

আমিও তাই বলছি বড় সাহেব। আমিও তাই বলছি। তবে কি করে যে বন্দীগুলো চুরি হয়েও থেকে গেলো তাই ভাবছি।

ও আপনি দেখছি না বলতেই আন্দাজ করে নিয়েছেন ওস্তাদজী।

হাঁ আপনার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি মিঃ লিয়নের প্রেতআত্মা খুব করে ঠকে গেছে।

আমাকে ঠকাবে জ্যান্ত মানুষ নয় মরা মানুষ। হাসলো মিঃ প্রিন্স তারপর বললো—মাটির নিচে আমার এখনও দুটো গুপ্ত বন্দী শিবির আছে।

বলেন কি বড় সাহেব এতো বড় আনন্দের কথা খুশিতে যেন ডগ মগ হয়ে উঠে বৃদ্ধ চাচা।

লছমিয়া তখন একখিলি পান গালে গুঁজে দিয়ে বলে সেখানে মেয়ে লোক আছে তো?

মেয়ে লোক মানে, সব-সব মেয়ে লোক। গোপন বন্দী শিবিরে পুরুষ রাখবো! ওদের দাম পাবো, না কেউ ওদের পয়সা দিয়ে কিনবে। বাছাই করা তরুণীদের রেখেছি সেখানে।

এবার লছমিয়ার চোখ দুটো জ্বলে উঠে যেন, বলে সে—তাহলে কাল কয়েকটা মাল পাঠাবে৲

কটা চাই?

আপাতত পাঁচটা হলেই চলবে।

প্রিন্স বললো--পাঁচটা পঞ্চাশ হাজার লাগবে।

টাকার জন্য চিন্তা করবেন না বড় সাহেব। টাকা ঠিক মতই পেয়ে যাবেন। তবে আর একটা কথা......

বলো লছমিয়া? ক্রমেই কথাগুলো জড়িয়ে আসছে মিঃ প্রিন্সের।

লছমিয়া বললো--যে মেয়েটি আপনার বাসায় আছে সেই মেয়েটিকে যদি বিক্রি করেন তাহলে মোটা টাকা পাবেন।

কার কথা বলছো লছমিয়া? ঐ যে বৃদ্ধা সামরিক অফিসার আলী কাওসার-এর মেয়ে নাসিমা খানের কথা বলছো?

হাঁ হাঁ নাসিমা খান। বড় সুন্দরী মেয়ে। ওকে আমরা চাই বড় সাহেব। যত টাকা চান তাই পাবেন।

লছমিয়ার কথায় বলে মিঃ প্রিন্স--নাসিমা খানকে এতো ভাল লাগলো কেনো? ও ছাড়া আরও সুন্দরী মেয়ে মানুষ আছে আমার মাটির নিচের গোপন বন্দী শালায়।

না নাসিমা খানকেই চাই। হীরা ঝিলের মালিক জাফর হুসাইন তাকে দেখেছিলো এবং ওকে কিনে নেবার জন্য যত টাকা লাগে দেবে বলেছে।

জাফর হুসাইন নাসিমা খানকে দেখলো কি করে লছমিয়া বলো?

যেদিন আপনার লোক নাসিমা খানকে অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে বন্দী করে আমার হোটেলে আনে ঐ দিন জাফর হুসাইন সেখানে ছিলো। সেদিনের পর থেকেই ওকে কিনে নেবার জন্য সে-জেদা-জেদি করে কিন্তু আমি এতোদিন তাকে ঠাণ্ডা করে রেখে ছিলাম শুধু বড় সাহেব আপনার মুখ চেয়ে, কারণ আপনি বলেছিলেন ঐ মেয়েটিকে আপনি খুব পছন্দ করেছেন।

হাঁ আমি প্রথম থেকেই ঐ মেয়েটিকে পছন্দ করি কিন্তু ফল হয়নি লছমিয়া।

তার মানে?

মানে নাসিমা খান নাগরাণী। ওকে কেউ স্পর্শ করতে পারবেনা। বড় শক্ত, বড় ভয়ঙ্কর মেয়ে.......

তাহলে বেচে দেন বড় সাহেব।

হাঁ বেচেই দেবো, কারণ আমি নাসিমা খানকে আমার বাড়িতে রেখে অনেক চেষ্টা করেছি তাকে আয়ত্বে আনতে কিন্তু পারিনি। জান দেবে তব ইজ্জৎ দেবেনা।

লছমিয়া হেসে বললো–সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি ওকে বাগিয়ে নেবো। জাফর হুসাইন যখন ওকে কিনতে চায় তখন দিয়ে দেন বড় সাহেব।

এবার মাথা চুলকে বলে প্রিন্স--জানতো লছমিয়া আমার পিছনে ফেউ লেগেছে। কখন যে সে আমার ঘাড় মটকাবে জানিনা।

লছমিয়া ভ্রুকুচকে বললো–আরে ছোর আপনি হলেন বীর রাজা আর আপনি কিনা ভয় করেন ফেউ কে?

এবার কথা বললো চাচা–ও তুমি বুঝবেনা এরা বড় সাংঘাতিক জিনিস। এরা মরা মানুষকে জ্যান্ত করতে পারে এবং জ্যান্ত মানুষকে মরা বানাতে পারে। সব পারে এরা......

হাঁ হাঁ ঠিক বলেছেন ওস্তাদজী! বড় সত্য কথা বলেছেন, না হলে আমার ঘরে কি করে প্রবেশ করছিলো সে। ভাগ্যিস জানে মারেনি, না হলে আজ আর এই তোমার সামনে আসতে হতোনা।

বড় আফসোসের কথা বড় সাহেব। ভাগ্যিস বলতে হবে, না হলে আমাদের উপায় কি হতো। মাল পেতাম কোথায়? কথাগুলো বললো লছমিয়া।

চাচা একগাল হেসে বললো–মাল কি আর শুধু বড় সাহেবের গুদামে আছে! মাল তো ছড়িয়ে আছে পাকিস্তানের সব জায়গায়। যতদিন পাকিস্তানে বাঙ্গালী থাকবে ততদিন কোন চিন্তা করোনা লছমিয়া। বাঙ্গালীরা পাকিস্তানে এমন অবস্থায় আছে, গোটা পাকিস্তান এখন তাদের কাছে বন্দী সালা। ইচ্ছা হলে আমরা তাদের বাঁচিয়ে রাখতে পারি আবার মারতে পারি। ধরেও আনতে পারি।

মিঃ প্রিন্স বললো– একেবারে খাটি কথা। এটা তো বাংলাদেশ নয়, এটা পাকিস্তান, আমাদের দেশ। এই দেশে আমরা বাঙ্গালী দুষমনকে থাকতে দেবোনা। সবাইকে খতম করবো। মিঃ প্রিন্স হাত বাড়িয়ে মদের পূর্ণ গেলাসটা তুলে নিলো তারপর হেসে বললো–বহুৎ বাঙ্গালী সুন্দরী আছে। নাসিমা খান ছাড়া যাকে খুশি তোমার জাফর হুসাইন নিতে পারে।

এমন সময় পাশে কামরা থেকে বেরিয়ে আসে লম্বা গোঁফ, অগ্নি চক্ষু, এক বিহারী পালোয়ান। মাথায় রাশি কৃত চুল, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। বসন্তের দাগে মুখখানা আরও ভয়ঙ্কর লাগছে। গর্জন করে বললো সে—না জাফর হুসাইন নাসিমা খানকেই নেবে।

চমকে মুখ তুললো বড় সাহেব মিঃ প্রিন্স।

লছমিয়াও চমকে উঠলো ভীষণভাবে।

মিঃ প্রিন্স তখন উঠে দাঁড়িয়েছে, রাগত কণ্ঠে বললো—নাসিমা খানকে আমি বিক্রি করবোনা। কে তুমি?

লছমিয়া ঢোক গিলে বললো—ইনিই জাফর হুসাইন হীরাঝিলের মালিক......

ও তাই এতো সাহস। বললো বড় সাহেব।

কি বললে, আমাকে তুমি সাহসের কথা বলে রাগাচ্ছো। জানোনা আমি এক সঙ্গে তোমার মত সাতটা জোয়ানকে খতম করতে পারি? জাফর হুসাইন জামার ভিতর থেকে খচ্ করে একটা ছোরা বের করলো তারপর ছোরা খানার নিচে চাপ দিতেই সূতীক্ষ্ণ ধার আগাটা চক্ চক্ করে উঠলো।

মিঃ প্রিন্সও তার জামার ভিতর থেকে একখানা ধারালো ছোরা বের করে মেলে ধরলো।

লছমিয়ার অলক্ষে কখন যে জাফর হুসাইন হোটেল হাবহিলায় এসে হাজির হয়েছিলো জানতে পারেনি সে। জাফর হুসাইন লছমিয়ার একজন বড় খরিদ্দার। এবার সে চোখ দুটো কপালে তুলে ভয়ে কাঁপতে থাকে। অবশ্য আজ এ ব্যাপার নতুন নয়। তার হোটেলে প্রায়ই এমন ছোরা নিয়ে মারামারি লেগেই থাকে। তবু আজ একটু ঘাবড়ে যায় সে, কারণ আজ যারা খুলেছে তারা অন্যান্য দিনের ছোটখাটো গুণ্ডা নয়, এরা নাম করা জাদরেল লোক। একজন হোটেল গুলবাগের মালিক মিঃ প্রিন্স আর একজন হলো হীরাঝিলের মালিক জাফর হুসাইন।

লছমিয়া কি করবে ভেবে পাচ্ছেনা।

চাচা তখন আপন জান বাঁচা বলে সরে পড়ার জোগাড়ে ছিলো। হঠাৎ এমন অবস্থায় পড়বে সে ভাবতে পারেনি। তবু দু'টো গেলাসে মদ ঢেলে তুলে ধরলো দু'জনার সামনে—খেয়ে নিন সব মিটে যাবে!

জাফর হুসাইন এক থাবায় চাচার হাত থেকে মদের গেলাসটা ফেলে দিয়ে বললো—ভাগ্ বুঢ্যা। শোন প্রিন্স তুমি যতই বলো নাসিমা খানকে

আমার চাই। আমি জানি তুমি তাকে নিজের বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছো। আমি অনেক দিন থেকে ওকে কিনবো বলে তোমার কাছে লোব পাঠিয়েছি কিন্তু......

মিঃ প্রিন্স বলে উঠলো—আমার মাল আমি যদি বিক্রি না করি?

বহুদিন বহু টাকা আমার খেয়েছো প্রিন্স। এবার টাকা না দিয়েই আমি নাসিমা খানকে নেবো।

না হবেনা.....কথা শেষ না করেই ঝাপিয়ে পড়ে মিঃ প্রিন্স জাফর হুসাইনের উপর।

শুরু হয় ভীষণ ধস্তাধস্তি।

কাঁচের বাসনের ঝনঝন খণখণ আওয়াজ আর ধুম্‌ধাম্‌ মাটিতে পড়ার শব্দ নিস্তব্ধ রাতটাকে কাঁপিয়ে তোলে।

চাচা ততক্ষণে সরে পড়েছে।

লছমিয়া এক পাশে দাঁড়িয়ে কাঁপতে শুরু করেছে। এক দিকে তার হোটেলের ভীষণ ক্ষতি হচ্ছে অন্যদিকে খুন হলে পুলিশের ভয়। লছমিয়া কি করবে ভেবে পাচ্ছেনা।

চাচা বেরিয়ে আসে হোটেল হাবহিলার বাইরে। মিঃ প্রিন্সের গাড়িতে তখন ড্রাইভার বসে বসে ঝিমুচ্ছে, চাচা গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ায়।

ড্রাইভার সম্পূর্ণভাবে ঘুমিয়ে পড়েছে।

চাচা পিছন থেকে ড্রাইভারের মুখ এবং গলা-চেপে ধরে তারপর টেনে নামিয়ে ফেলে গাড়ি থেকে। ও পাশে পাম্‌ গাছের ঝাড়টার পিছনে নিয়ে গিয়ে আলগোছে শুইয়ে দেয়। কারণ সে প্রথম চাপেই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলো।

চাচা তার পাকা দাড়ি গোঁফ খুলে ফেলে দ্রুত হস্তে, তারপর পরে নেয় ড্রাইভারের ড্রেস। গাড়িতে এসে যখন বসলো তখন হোটেলেরে মধ্যে ভীষণ সোর হাঙ্গামা পড়ে গেছে। মিঃ প্রিন্স ও জাফর হুসাইনের মারা-মারি ধস্তা-ধস্তিতে হোটেলের ঘুমন্ত বয় এবং বাঈজী দল সবাই জেগে উঠেছে। কে কোন দিকে ছুটছে। ড্রাইভারের কানে ভেসে এলো লছমিয়ার গলা, নিশ্চয়ই সে পুলিশ অফিসে ফোন করছে। ধুমধাম শব্দটা বেড়ে গেছে তার সঙ্গে শিশি বোতল ভাঙ্গার শব্দ হচ্ছে ভীষণ ভাবে।

বিপুল উন্মাদনা নিয়ে প্রতিক্ষা করতে থাকে ড্রাইভার।

হঠাৎ এক সময় হোটেল থেকে বেরিয়ে আসে, জাফর হুসাইন। অদূরে একটি মোটর সাইকেল দাঁড় করানো ছিলো জাফর হুসাইন মোটর সাইকেলটায় বসে সঙ্গে সঙ্গে উল্কা বেগে ছুটলো।

একটু পরেই রীতিমত হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে এলো মিঃ প্রিন্স। গাড়িতে দ্রুত উঠে বসেই বললো—সামনের মোটর সাইকেলটাকে ফলো করো।

ড্রাইভার মালিকের আদেশ মত গাড়ি চালাতে শুরু করলো। ডবল স্পীডে গাড়ি ছুটছে। মোটর সাইকেল নিয়ে হুসাইন হাওয়ায় উড়ে চলেছে যেন।

গভীর রাতের নির্জন পথ কাজেই গাড়ি চালাতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না ড্রাইভারের। কিন্তু ড্রাইভার আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে জাফর হুসাইনের মোটর সাইকেল চালনার দক্ষতা দেখে।

মোটর সাইকেলটা মাঝে মাঝে পথের বাকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। শুধু শব্দ লক্ষ্য করে গাড়ি চালাচ্ছে ড্রাইভার। গাড়ি দ্রুত ছুটছে মিঃ প্রিন্স ততই স্পীড়ে চালাচ্ছে ড্রাইভার। গাড়ী দ্রুত ছুটছে মিঃ প্রিন্স ততই স্পীডে গাড়ি চালাতে নির্দেশ দিচ্ছে।

গাড়িখানা ক্রমে মিঃ প্রিন্সের বাড়ি অভিমুখে অগ্রসর হতে লাগলো। কারণ মোটর সাইকেলের শব্দটা ঐ পথেই এগিয়ে যাচ্ছিলো।

অল্পক্ষণেই পৌছে গেলো মিঃ প্রিন্স তার বাড়ির গেটে। কিন্তু মোটর সাইকেল কোথায়, কিছু পূর্বেও তার গাড়িতে বসে মোটর সাইকেলের আওয়াজ পাচ্ছিলো। হঠাৎ গাড়িখানা গেলো কোথায়?

মিঃ প্রিন্স এর গাড়ি গেটে পৌছতেই গেটম্যান গেট খুলে দিলো। ভিতরে প্রবেশ করলো গাড়ি।

গাড়ি বারেন্দায় থামতেই মিঃ প্রিন্স নেমে পড়লো এবং ছুটে গেলো নিজের শয়ন কক্ষে। কক্ষের মধ্যে একটি গোপন দরজা ছিলো ঐ দরজাটা খোলা দেখতে পেলো সে, সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলো, তারপর সেই গোপন দরজা দিয়ে প্রবেশ করলো দেয়ালের ভিতরে। একটি সুড়ঙ্গ পথ, ঐ পথে নিচে নেমে গেলো মিঃ প্রিন্স।

ততক্ষণে জাফর হুসাইন নাসিমা খানকে নিয়ে গোপন কক্ষের পিছন দরজা দিয়ে ভেগেছে। মিঃ প্রিন্স ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের মত হুঙ্কার ছাড়লো। সে ফিরে আসবার পূর্বেই তার মুখের গ্রাস আর এক জন ছিনিয়ে নিয়ে গেলো। কি

করে সে তার গোপন কক্ষের গোপন দরজার সন্ধান পেয়েছে বুঝতে পারলোনা।

নিজের কামরায় ফিরে এলো মিঃ প্রিন্স, ড্রয়ার খুলে রিভলভার খানা বের করে নিলো তারপর এক একটি করে সবগুলো পাহারাদার এবং দারওয়ানকে গুলি করে হত্যা করলো সে নিজ হাতে।

ঠিক ঐ সময় একটা হাসির শব্দ ভেসে এলো তার কানে। অদ্ভুত অট্ট হাসি, অবাক হলো প্রিন্স এ হাসির শব্দ এলো কোথা থেকে।

বাড়ির চাকরগণ থর থর করে কাঁপছিলো। কারণ মালিক যখন একজনের পর একজনকে শুধু হত্যাই করে চলেছে তখন তাদের অবস্থা শোচনীয় হওয়া স্বাভাবিক। মালিক চাকর বাকর এবং বাকি ক'জন দারওয়ানকে লক্ষ্য করে বললো–তোমরা দেখো এই হাসির শব্দ এলো কোথা থেকে? কে এমন করে অট্ট হাসি হাসলো। যাও খুঁজে বের করো তাকে, না হলে গুলি করে তোমাদের সবাইকে হত্যা করবো।

চাকর বাকর দারওয়ান সবাই ছুটলো, গোটা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজলো কিন্তু কোথাও কাউকে পেলোনা।

একজন এসে সংবাদ জানালো, মালিক কোথাও কাউকে পেলাম না।

মিঃ প্রিন্স তখন রাগে ফুলে আছে কারণ তার মুখের গ্রাস আর একজন কেড়ে নিয়ে গেছে। লোকটা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাকে গুলি করে হত্যা করলো মিঃ প্রিন্স।

এরপর নিজেই সে বেরিয়ে এলো, গাড়ি বারেন্দায় তখন গাড়ি অপেক্ষা করছে। গাড়িতে বসে আছে ড্রাইভার। যদিও সে এতোক্ষণ গাড়িতে ছিলোনা, অন্তপুরেই ছিলো সে মিঃ প্রিন্সের আশে পাশেই। এবার ড্রাইভার গাড়িতে বসে প্রতিক্ষা করতে থাকে। গাড়ির পাশে আসতেই ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে ধরে।

মিঃ প্রিন্স গাড়িতে উঠে বসে–হাবহিলা ক্লাবে চলো।

আবার গাড়ি ছুটলো।

ড্রাইভারের হাতে গাড়িখানা যেন হাওয়ায় উড়ে চলেছে।

বেশি সময় লাগলোনা মিঃ প্রিন্সের গাড়ি হাবহিলা ক্লাব গৃহের সম্মুখে এসে থামলো। গাড়ি থামতেই মিঃ প্রিন্স রিভলভার হাতে দ্রুত নেমে ক্লাব গৃহে প্রবেশ করলো। সোজা সে এসে হাজির হলো লছমিয়া বাঈজীর কক্ষে।

লছমিয়া কেবল শয্যা গ্রহণ করতে যাবে এমন সময় মিঃ প্রিন্স তার বুকে রিভলভার চেপে ধরে বললো–তুমিই ঐ শয়তান জাফর হুসাইনকে আমার বাড়ির পথ চিনিয়ে দিয়েছো আর আমার ভূগর্ভ গোপন কুঠরীর সন্ধান জানিয়েছো! বলো সে নাসিমাকে কোথায় নিয়ে গেছে'?

লছমিয়া যেন আকাশ থেকে পড়লো, অবাক হয়ে বললো–আপনার নাসিমাকে জাফর হুসাইন কোথায় নিয়ে গেছে জানিনা। আপনি আমাকে কেনো মারতে যাচ্ছেন'?

তুমি ছাড়া কেউ জানতোনা নাসিমা কোথায় আছে। কাজেই তুমিই তাকে পথের সন্ধান বলে দিয়েছো লছমিয়া। আমি তোমাকে কিছুতেই ক্ষমা করবোনা। সঙ্গে সঙ্গে গুলি বেরিয়ে আসে মিঃ প্রিন্সের রিভলভার থেকে।

লছমিয়া আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লো ভূতলে।

হাবহিলা ক্লাবের সোনালী কার্পেট রাঙা হয়ে উঠলো লছমিয়ার বুকের রক্তে।

ফিরে তাকাতেই প্রিন্স দেখলো তার ড্রাইভার দাঁড়িয়ে আছে পিছনে বললো প্রিন্স–তুমি আবার গাড়ি থেকে নেমে এসেছো কেনো'? চলো জাফর হুসাইনকে খুঁজে বের করতেই হবে। প্রিন্স এবার লছমিয়ার বুকের উপর পা তুলে দিয়ে বললো–বলো কোথায় সেই শয়তান'? যার জন্য তুমি প্রাণ হারালে'? বলো......

লছমিয়া যন্ত্রনায় ছটফট করছিলো; কোঁকিয়ে কোঁকিয়ে বললো–নাসিমাকে নিয়ে জাফর হুসাইন ইরান অভিমুখে যাত্রা করেছে আজ ভোরে সে নিজস্ব প্লেনে......কথা শেষ করতে পারলো না লছমিয়া। প্রাণ বায়ু তার বেরিয়ে গেলো আলগোছে।

মিঃ প্রিন্স কি যেন ভাবছিলো লছমিয়ার মৃত দেহটীর দিকে তাকিয়ে। ড্রাইভার বললো–স্যার বড্ড দেরী হয়ে গেলো, রাত্রি ভোর হবার পূর্বেই লাহোর ত্যাগ করবে।

মিঃ প্রিন্সের যেন হুস হলো বললো–চলো। লছমিয়ার কথায় বোঝা গেলো সে নিজস্ব প্লেনে ইরান অভিমুখে পালিয়েছে।

ড্রাইভার বললো–স্যার, এখনও পালায়নি তবে ভোর হবার আগেই পালাবে বলে মনে হচ্ছে।

প্রিন্স বললো–আজ তোমাকে বুদ্ধিমানের মত লাগছে। তোমার কথাগুলো যেন বেশ পাকা পাকা......

স্যার বেশি সময় নষ্ট করা ঠিক্ হবে না, চলুন। তাছাড়া পুলিশ এসে পড়তে পারে তখন নতুন বিপদে পড়বেন।

হাঁ ঠিক্ বলেছো। প্রিন্স গাড়িতে এসে বসলো।

ড্রাইভার গাড়িতে বসে ষ্টার্ট দিলো।

হাওয়ার বেগে ছুটলো গাড়িখানা।

এক হাতে নাসিমা খানকে ধরে রেখেছে অপর হাতে মোটর সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরে আছে জাফর হুসাইন। মোটর সাইকেল খানা স্পীডে ছুটে চলেছে। নাসিমা খান মাঝে মাঝে আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠছে–বাঁচাও......বাঁচাও......বাঁচাও......

নির্জন পথ ধরে মোটর সাইকেলখানা এগুচ্ছে, কেউ শুনতে পায়না অসহায়া নাসিমা খানের ক্ষীণ করুণ আর্তনাদ। চুলগুলো তার এলোমেলো বাতাসে উড়ছে। বস্ত্রাঞ্চল খানাও ঝুলছে। সে এক অদ্ভুত অবস্থা। মোটর সাইকেল খানা যে লাহোর বিমান বন্দরের দিকে এগিয়ে চলেছে তাতে কোন সন্দেহ নাই।

জনহীন পথ।

দু'পাশে সুউচ্চ দালান কোঠা। কিন্তু কোথাও আলোর চিহ্ন নাই। বাড়িগুলো দেখলে মনে হচ্ছে যেন কোন ঘুমন্ত রাজপুরি।

সুউচ্চ দালান কোঠার ফাঁকে আকাশের কিছু অংশ দৃষ্টিগোচর হয় কিন্তু আকাশের রং স্পষ্ট চোখে পড়ে না। জমাট অন্ধকার পথটা।

মোটর সাইকেলের শব্দটা নির্জন পথ এবং বাড়ির দেওয়ালগুলিতে প্রতিধ্বনি জাগাচ্ছিলো। নাসিমার দেহটা ঝুলছে বলিষ্ঠ জোয়ান জাফর হুসাইনের হাতের মধ্যে। হাত পা ছুড়ছে সে অনবরত।

বিমান বন্দরে পৌঁছতেই দু'জন লোক এসে জাফর হুসাইনকে অভ্যর্থনা জানালো, তারা গাড়িখানা ধরলো, জাফর হুসাইন নাসিমাকে নামিয়ে নিলো গাড়ি থেকে নিচে। তারপর টেনে নিয়ে চললো তাকে বিমান বন্দরের নির্জন প্রান্তর দিকে। ওদিকে একটি বিমান অপেক্ষা করছে, জাফর হুসাইন নাসিমাকে নিয়ে সেই বিমানে চেপে বসলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে মিঃ প্রিন্সের গাড়ি প্রবেশ করলো বিমান বন্দরে। গাড়ি রেখে নেমে পড়লো ড্রাইভার স্বয়ং আর মিঃ প্রিন্স।

মিঃ প্রিন্স ছুটলো বিমান খানার দিকে।

ড্রাইভার চলেছে তার পিছনে তাকে অনুসরণ করে।

মিঃ হুসাইন যখন প্লেনের দরজা বন্ধ করতে যাবে সেই মুহূর্তে ড্রাইভার বলিষ্ঠ হাতে দরজা খুলে ধরলো, প্রিন্স প্রবেশ করলো সেই সুযোগে।

জাফর হুসাইন ক্ষিপ্তের ন্যায় প্লেনের চালককে আদেশ দিলো প্লেন আকাশে উড়াতে। পাইলটা পূর্ব হতেই প্রস্তুত ছিলো প্লেন রান-ওয়ের দিকে এগুলো।

প্লেন আকাশে উড়তে মোটেই বিলম্ব হলো না।

এদিকে প্লেনে মিঃ প্রিন্স উঠে গেছে, সে উদ্যত রিভলভার হাতে এগুচ্ছে জাফর হুসাইনের দিকে।

জাফর হুসাইন বাম হাতে ধরে আছে নাসিমাকে আর দক্ষিণ হাতে বের করে নিয়েছে একটা পিস্তল। নাসিমাকে জাফর হুসাইন ঠিক্ বুকের কাছে ধরে রেখেছে।

মিঃ প্রিন্স সে কারণে সহসা গুলি ছুড়তে পারছে না।

ড্রাইভার একপাশে হেলান দিয়ে তামাসা দেখছে। সে যদি গাড়িখানাকে ঠিকমত চালিয়ে না আসতে পারতো তা হলে জাফর হুসাইনের প্লেনখানা প্রিন্স কিছুতেই ধরতে পারতো না। তা ছাড়া জাফর হুসাইন প্লেনের দরজা প্রায় আটকে ফেলেছিলো ড্রাইভারই কৌশলে দরজা খুলে প্লেনে উঠে পড়েছে। এখন সে নীরব দর্শকের মত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে।

শেষ পরিণতি কি দাঁড়ায় দেখতে চায় ড্রাইভার। তবে অসহায়া নাসিমার জন্য তার বড় খারাপ লাগছিলো। বেচারী একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছে। একে অনাহার তারপর নির্যাতন অকথ্য অত্যাচার। নাসিমাও অন্যান্য বাঙ্গালী বন্দীদের মতই তরুণী কিন্তু তার প্রতি ঐ নরপিশাচদের একটা প্রচণ্ড আকর্ষণ। নাসিমা সত্যি সুন্দরী। সহসা এমন মেয়ে বড় একটা চোখে পড়েনা এবং নাসিমার এই সৌন্দর্যই তার কাল হয়েছে। বেচারী নাসিমার কণ্ঠ মৌনস্তব্ধ হয়ে গেছে। সে শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে।

অল্পক্ষণেই শুরু হলো তুমুল লড়াই।

দু'জনই হাতের আগ্নেয় অস্ত্র ছুড়ে ফেলে দিলো কারণ নাসিমাকে তারা হারাতে চায় না। লড়াইএ জিতে তারা ওকে পেতে চায়।

দু'জনার লড়াই শুরু হলো।

নাসিমা তখন একপাশে জড়োসড়ো হয়ে কাঁপছে। প্লেনখানা তখন লাহোর বিমান বন্দর ছেড়ে অনেক উপর দিয়ে উড়ে চলেছে। ধস্তাধস্তি হচ্ছে

দু'জনার মধ্যে, সেই ভীষণ লড়াই। সিংহ আর ব্যাঘ্রতে যেন মারামারি হচ্ছে।

সেই ফাঁকে নাসিমা খান প্লেন থেকে লাফিয়ে পড়তে যায় মিঃ প্রিন্স এবং জাফর হুসাইনের দৃষ্টি এড়িয়ে।

ড্রাইভার ওকে ধরে ফেলে পিছন থেকে।

বিস্ময় ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকায় নাসিমা ড্রাইভারের মুখের দিকে।

ড্রাইভার তখনও নাসিমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে স্থির দৃষ্টি মেলে। নাসিমা ঐ চোখ দু'টির মধ্যে এক নতুন দৃষ্টি আবিষ্কার করে সহসা চোখ দুটো সরিয়ে নিতে পারেনা সে।

ততক্ষণে মিঃ প্রিন্স একখানা ছোরা বের করে নিয়ে বসিয়ে দিতে যায় জাফর হুসাইনের বুকে! সঙ্গে সঙ্গে জাফর হুসাইন প্রচণ্ড এক লাথি দিয়ে ফেলে দেয় তাকে।

প্লেনের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায় মিঃ প্রিন্স মেঝেতে, হাতের ছোরাখানা ছিটকে পড়ে দূরে। আবার সে উঠে আক্রমণ করে জাফর হুসাইনকে।

প্লেনখানা তখন কয়েকটা প্রান্তর পেরেয়ে এগিয়ে চলেছে।

ওদিকে পূর্বাকাশ ফর্সা হয়ে আসছে।

নাসিমা হতবাক হয়ে দুই পালোয়ানের লড়াই দেখছে। চোখে-মুখে তার একটা ভীত আতঙ্কিত ভাব ফুটে উঠেছে। কি করবে সে ভেবে পাচ্ছে না যেন।

আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলো ড্রাইভারটা তাকে বাঁচিয়ে নিলো না হলে, এতোক্ষণ সে এদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যেতো। বার বার সে তাকাচ্ছে ঐ ড্রাইভারটার দিকে। ওর চোখের দৃষ্টিতে সে কুৎসিৎ লালসাপূর্ণ ভাব দেখতে পায়নি বরং দেখতে পেয়েছে একটা অপূর্ব ভাব গম্ভীর চাহনী।

প্লেনখানা তখন হাজার ফুট উপর দিয়ে উড়ে চলেছে। ইরান অভিমুখে চলেছে প্লেনখানা তাতে কোন সন্দেহ নাই। অর্ধঘন্টার মধ্যে প্লেনখানা ইরান সাগরের উপরে এসে পড়লো।

তখনও চলেছে জাফর হুসাইন আর মিঃ প্রিন্স মিলে তুমুল লড়াই। রীতিমত হাঁপিয়ে পড়েছে তারা। এবার ড্রাইভার জাফর হুসাইন আর মিঃ প্রিন্স-এর মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। প্রচণ্ড এক একটা ঘুষিতে কাহিল করে ফেললো তাদের দু'জনকে।

ড্রাইভার তখন তার মুখের দাড়ি গোঁফ খুলে ফেলেছে।

মিঃ প্রিন্স বলে উঠে–এ্যা মিঃ লিয়ন......

বজ্র গম্ভীর কণ্ঠে বললো ড্রাইভার–লিয়নের; প্রেতআত্মা। যমদূত লিয়নকে হত্যা করেছিলো.......

কিন্তু তুমি, তুমি এলে কি করে?

তোমার গাড়ির ড্রাইভার বেশে......

এ্যা......শব্দটা করেই মিঃ প্রিন্স ঝাপিয়ে পড়লো মিঃ লিয়নের উপর।

জাফর হুসাইন সরে গিয়ে ধরে ফেললো নাসিমাকে। সে এ সুযোগটুকু নষ্ট করতে চাইলো না।

মিঃ লিয়ন প্রিন্স–এর চোয়ালে একটা প্রচণ্ড ঘুষি বসিয়ে দিতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো। সেই মুহূর্তে মিঃ লিয়ন জাপটে ধরলো জাফর হুসাইনকে। একটানে নাসিমাকে ছাড়িয়ে নিলো ওর কাছ থেকে তারপর একা সে দু'জন দুর্দান্ত নরপিশাচের সঙ্গে লড়াই করে চললো।

মিঃ লিয়নের সঙ্গে ওরা দু'জন পেরে উঠলো। লিয়ন মিঃ প্রিন্সকে প্রচণ্ড ধাক্কায় ফেলে দিলো নিচে। মিঃ প্রিন্স ঘুরপাক খেতে খেতে পৃথিবীর দিকে এগুতে লাগলো।

প্লেনখানা তখন ইরান সাগর পাড়ি দিচ্ছিলো।

এবার মিঃ লিয়ন ফিরে তাকালো জাফর হুসাইনের দিকে। জাফর হুসাইন তখন নেকড়ে বাঘের মত গর্জন করছিলো।

নাসিমা খান বিস্মিত হতবাক হয়ে গেছে, সে যেন কিছু বুঝতে পারছে না। তবে এটুকু বুঝতে পেরেছে নাসিমা যে তাকে নিয়েই চলেছে এদের মারামারি। একজনকে শেষ করে দেওয়া হলো এবার রয়েছে দু'জন।

জাফর হুসাইন মরিয়া হয়ে উঠেছে। তার ঠোঁট কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। কপালের এক জায়গায় কেটে গেছে তার।

মিঃ লিয়ন আর জাফর হুসাইনের এবার যুদ্ধ শুরু হলো। প্লেনখানা তখন দেড় হাজার ফুট উঁচু দিয়ে উড়ে চলছে।

পাইলটা তার কর্তব্য করে চলেছে, মুহূর্তের জন্য সে অসতর্ক হয়নি। একটু অমনোযোগী হলেই প্লেনে আগুন ধরে যাবার সম্ভাবনা আছে। কাজেই সে সব কিছু টের পেলেও নীরবে বসে রয়েছে তার আসনে।

এবার মিঃ লিয়ন জাফর হুসাইনকে কাহিল করে ফেললো। ভীষণ মুষ্টিঘাতে ওর নাকে মুখে রক্ত বেরিয়ে এলো। এবার মিঃ লিয়ন জাফর হুসাইনকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দিলো।

জাফর হুসাইন নিচে না পড়ে প্লেনের দরজার এক অংশ চেপে ধরে রইলো।

মিঃ লিয়ন মনে করলো জাফর হুসাইন নিচে পড়ে গেছে। সে ফিরে এলো নাসিমার পাশে।

নাসিমা ভয়ে মরারমত ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। মিঃ লিয়ন যখন তার দিকে এগুচ্ছিলো তখন সে পিছু হটে ওদিকের দরজা দিয়ে নিচে লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছিলো। সে জানে এবার আর তার নিস্তার নেই নিশ্চয়ই লোকটা তাকে ধরে ফেলবে এবং যা খুশি করবে সে।

নাসিমা ভীত ভাবে যেমন প্লেন থেকে পূর্বের ন্যায় লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছিলো তখন মিঃ লিয়ন আবার ওকে ধরে ফেললো, এবার নাসিমা মিঃ লিয়নের হাতে কামড়ে দিলো–না না তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। আমি আত্মহত্যা করবো......

মিঃ লিয়ন গম্ভীর গলায় বললো–নাসিমা তুমি ভুল করো না। আমাকে বিশ্বাস করো আমি তোমার কোন ক্ষতি করবো না......

বহুদিন পরে আজ নতুন এক সুর সে শুনতে পেলো। এযে খাটি মধুর বাংলা ভাষা। বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে তাকালো নাসিমা মিঃ লিয়নের মুখে। আজ কত দিন সে এমন সুমিষ্ট কণ্ঠ শোনেনি। শোনেনি সে মায়ের ভাষা।

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে নাসিমা আরও একটা বিস্ময় জাগছে তার মনে। এক অপরিচিত দুর্ধর্ষ ব্যক্তির মুখে তার নাম। কে এই ব্যক্তি, কিই বা তার পরিচয় আর তাকেই বা চিনলো কি করে।

মিঃ লিয়ন একটু হাসার চেষ্টা করে বললো–জানি তুমি অবাক হচ্ছো। পরে সব জানতে পারবে। আমি তোমার মঙ্গলপ্রার্থী কাজেই এখন চুপ করে বসো আমি এবার প্লেন চালককে পথের নির্দেশ দেই। কারণ সে শত্রু পক্ষের পাইলট......কথা শেষ করে মিঃ লিয়ন জামার পকেট থেকে একটা রিভলভার বের করে নেয়।

চমকে উঠে নাসিমা, এই সময় লোকটাকে তার পরম বন্ধু বলে মনে হচ্ছে। আবার সে রিভলভার বের করায় চমকে উঠলো শুধু চমকে নয় শিউরে উঠলো নাসিমা। আবার কি তবে যুদ্ধ হবে। এবার যদি হেরে যায় এই লোকটা তখন কি হবে!

নাসিমা অসহায় করুণ চোখে তাকালো মিঃ লিয়নের মুখের দিকে।

মিঃ লিয়ন ততক্ষণে প্লেনের সামনের দিকে চলে গেছে।

পাইলট পিঠে ঠান্ডা একটা কিছু অনুভব করলো ফিরে তাকাবার পূর্বেই মিঃ লিয়ন কঠিন কণ্ঠে বললো–সামনে ফিরু বিমান বন্দর। ফিরু বন্দরে আমাকে নামিয়ে দাও।

পাইলট বুঝতে পারলো এখন কোন আপত্তি তার টিকবেনা কাজেই ইরান সাগরের দক্ষিণে ফিরু বন্দর সেখানে বিমান অবতরণ করাই মনস্থ কবলো।

মিঃ লিয়ন বললো–আমি ফিরু বন্দরে অবতরণের জন্য অনুমতি নিচ্ছি তোমাকে কোন কথা বলতে হবে না। মিঃ লিয়ন ওয়্যারলেসে ফিরু বন্দরের সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্য প্রস্তুতি নিলো।

এক মুহূর্তের জন্য মিঃ লিয়ন পাইলটের পিঠ থেকে রিভলভার সরিয়ে নিলোনা।

নাসিমা অবাক হয়ে দেখছে অদ্ভুত লোকটার অদ্ভুত কার্যকলাপ। প্রথমে তাকে দেখে ভীষণ ভয় পেলেও এখন অনেকটা ভীত ভাব কমে এসেছে। বরং নাসিমার অন্তরে একটা অনুভূতি জাগছে। এ যেন মানুষ নয় কোন একটা মহান ফেরেস্তা। তার বিপদ মুহূর্তে তাকে কি ভাবে বাঁচিয়ে নিলো সে। তা ছাড়া ওর যে শক্তির পরিচয় সে পেয়েছে তা অতি আশ্চর্য জনক। দু'জন বলিষ্ঠ দুর্ধর্ষ ব্যক্তিকে এই লোকটা অনায়াসে কাহিল করে প্লেন থেকে নিচে ফেলে দিলো।

যতই সে মিঃ লিয়নকে দেখছে ততই যেন আরও বিস্মিত আরও হতবুদ্ধি হচ্ছে। মনে মনে কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছে তার হৃদয়। সে তো ছোট্ট কচি মেয়েটি নয় নাসিমা এম, এ ক্লাশের ছাত্রী। লাহোর ইউনিভার্সিটিতে সে পড়তো। বাবা মা আরও দুটি ভাই ছিলো তাদের সংসারে। সুন্দর সুখী একটি পরিবার। পিতা একজন সামরিক অফিসার। বয়স হয়েছে এবার অবসরের পালা, সেই সময় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ব্যাপার নিয়ে পাকিস্তানে শুরু হলো বাঙ্গালী নির্যাতন। তারাও বাদ পড়লোনা, পাকিস্তানী হানাদারগণ অন্যান্য বাঙ্গালী অফিসারদের সঙ্গে তার পিতাকেও ধরে নিয়ে গেলো। শুধু পিতাকেই নয় তাদের সবাইকে ওরা আটক করে নিয়ে রাখলো কোন এক বন্দী শিবিরে।

বন্দী শিবিরে বহু বাঙ্গালীদের মধ্যে আটক থেকে নানা রকম অত্যাচার উৎপীড়ন ভোগ করতে লাগলো। সমস্ত দিন পর দু'খানা করে শুকনো রুটি খেতে দেওয়া হতো আর দেওয়া হতো এক গেলাস করে পানি। প্রাণ ভরে পানিও পেতোনা বন্দী শিবিরের বাঙ্গালীগণ।

ঐভাবে দিন কাটছিলো।

মাঝে মাঝে কতকগুলো বন্দী নারী পুরুষ বন্দী শিবির থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হতো। তাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে প্রশ্ন করলে সঠিক কোন জবাব পাওয়া যেতোনা। যাদের নিয়ে যাওয়া হতো তাদের আর ফিরিয়েও আনা হতো না। অসহায় বাঙ্গালীদের এই নিদারুণ অবস্থার কোন পরিবর্তন ছিলোনা। তাদের অপরাধ তারা বাঙ্গালী।

একদিন কতকগুলো গুণ্ডা বিহারী লোক তাদের বন্দী শিবিরে এসে ঢুকলো।

শিউরে উঠলো বন্দী শিবিরের অসহায় বাঙ্গালীগণ। এমনি করে প্রায় তাদের মধ্যে হানা পড়তো আর বের করে নিয়ে যাওয়া হতো বেছে বেছে তরুণ-তরুণীদের।

আজ আবার কার ভাগ্যে কি আছে কে জানে। বন্দী শিবিরের বাঙ্গালী বন্দীগণ থর থর করে কাঁপতে লাগলো।

নাসিমার বাবা মেজর ফিরোজ খানের মুখ কালো হয়ে উঠেছে। ক'দিন আগে তার ছেলে দু'টোকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো আর তারা ফিরে আসেনি। একমাত্র আদরের কন্যা নাসিমা এখন তাদের কাছে আছে। এতোদিন আদরের কন্যা নাসিমা এখন তাদের কাছে আছে। এতোদিন নাসিমাকে অতি সাবধানে গোপন করে রেখেছিলো কিন্তু আজ কি হবে কে জানে।

যেখানেই ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। নাসিমা আজ আর গোপনে সরে থাকতে পারলোনা তাকে দেখে ফেললো গুণ্ডাদল। একজন তাদের দলপতি বলে মনে হলো, সেই গুণ্ডাদলকে সঙ্গে করে সবাইকে দেখাচ্ছে। তবে আজ পুরুষ ছেলেদের নয় শুধু যুবতী মেয়েদের।

যে লোকটা দলপতি সে প্রায়ই আসতো এবং এ বন্দী শিবিরের মালিক ছিলো সে নিজে। আজ হঠাৎ নাসিমা তারই দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যায়।

একটা কুৎসিৎ কদাকার হাসিতে মুখ বিকৃত করে নাসিমাকে ধরে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে বৃদ্ধা জননী, আমার মাকে তোমরা ধরে নিয়ে যেওনা। সব নিয়েছো ওকে ফিরিয়ে দাও।

কে শোনে তার কথা, নাসিমাকে দলপতি নিজে পছন্দ করেছে, তার নিজের জন্য। অবশ্য যারা সেখানে এসেছিলো তাদের দৃষ্টি পড়ে নাসিমার উপর।

সেদিন আরও পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে নাসিমাকে নিয়ে চলে ওরা।

নাসিমার মা পথ রোধ করে দাঁড়ান, না না আমার মেয়েকে নিয়ে যেতে দেবোনা আমি কিছুতেই। নাসিমাও তার মাকে জড়িয়ে ধরে।

দলপতি তার একজন অনুচরকে হুকুম দেয় বৃদ্ধাকে খতম করে ফেলতে।

আদেশের সঙ্গে সঙ্গে একটা সূতীক্ষ্ণ ছোরা বিদ্ধ হয় নাসিমার জননীর বুকে।

ওদিকে তখন বৃদ্ধা মেজর ফিরোজ খানকে দু'জন লোক ধরে একটা থামের সঙ্গে বেঁধে ফেলেছে। বৃদ্ধ শুধু আর্তনাদ করে ডাকতে থাকেন, মা-নাসিমা ওরে ফিরে আয়। মা নাসিমা ফিরে আয়......

কিন্তু ততক্ষণে নাসিমা এবং আরও পাঁচজন তরুণীকে বন্দী শিবির থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

দলপতি অন্য কেহ নয়, দলপতি হলো স্বয়ং মিঃ প্রিন্স।

পাঁচজন তরুণীকে সে হাবহিলা ক্লাবের সর্দারণী বাঈজী লছমিয়ার কাছে বিক্রি করে দেয়, আর নাসিমাকে মিঃ প্রিন্স নিয়ে রাখে নিজের বাড়ির কোন এক গোপন কক্ষে।

নাসিমাকে আটকে রেখে তার উপর চালায় নানা রকম নির্যাতন, তবু নাসিমা মিঃ প্রিন্সের কুৎসিৎ উদ্দেশ্যকে স্বার্থক হতে দেয় না। নাসিমা কিছুতেই ধরা দেয় না শয়তানটার কাছে।

ওদিকে নাসিমার সৌন্দর্যের কথা প্রকাশ করে দেয় সেই গুণ্ডা দলটি লছমিয়া এবং তার রক্ষক হীরাঝিলের মালিক জাফর হুসাইনের কাছে।

জাফর হুসাইন হলো লাহোরের গুণ্ডাদলের সর্দার। সে নাসিমাকে পাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠে। লছমিয়াকে ব্যস্ত করে তোলে সে ভীষণভাবে। লছমিয়া স্বয়ং মিঃ প্রিন্সের কাছে নাসিমার জন্য অনুরোধ জানায় এবং যত টাকার বিনিময়ে চায় তাকে।

মিঃ প্রিন্স লছমিয়ার অনুরোধ রাখতে অস্বীকার করে আর টাকাও সে চায় না। নাসিমাকে সে রাখবে তার বিলাশ ভবনে।

লছমিয়া কিন্তু সাংঘাতিক মেয়ে ছিলো, সে মিঃ প্রিন্স-এর সঙ্গে মিল রেখে নাসিমার গোপন কক্ষের সন্ধান জেনে নেয় এবং জাফর হুসাইনকে সে পথের নির্দেশ দেয়।

সে কারণেই জাফর হুসাইন অতি সহজে মিঃ প্রিন্সের গোপন দরজা দিয়ে গোপন কক্ষে প্রবেশ করে, নাসিমাকে কাঁধে তুলে নিয়ে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলো।

তারপরের ঘটনা তো সব জানা।

নাসিমা নির্বাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে লোকটা সত্যি অসীম শক্তিশালী তাতে কোন ভুল নাই।

প্লেনখানা যখন ইরান সাগরের দক্ষিণ দিক অভিমুখে এগুচ্ছে। মিঃ লিয়ন ওল্যারলেসে যোগাযোগ করে নিচ্ছে ফিরু বিমান বন্দরের সঙ্গে, তখন প্লেনের নিচে ঝুলন্ত অবস্থায় চলেছে জাফর হুসাইন। অতি কষ্টে সে ঝুলে আছে। ওদিকে একটু এগুতে পারলেই জাফর হুসাইন প্লেনের তলদেশে একটি ছোরা খাপের মধ্যে উঠে পড়তে পারে। এ জায়গাটা সে নিজের ইচ্ছামত প্লেনের তলায় তৈরি করে নিয়েছিলো। কে জানতো একদিন এটা তারই পরম বিপদ মুহূর্তে কাজে লাগবে।

মরিয়া হয়ে ঝুলছে জাফর হুসাইন। আর এগুতে চেষ্টা করছে খাপটার দিকে। ভীষণ শক্তিশালী দুর্দান্ত ব্যক্তি বলেই সে এতোক্ষণ এমনভাবে উড়ন্ত প্লেনের নিচে ঝুলে থাকতে পারছে।

তবু কষ্ট হচ্ছে তার আর একটু তাহলেই গোপন খাপটা ধরে ফেলতে পারবে জাফর হুসাইন, প্লেনখানা এবার ইরান সাগরের দক্ষিণে ফিরু বিমান বন্দরের দিকে এগুচ্ছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরুতে অবতরণ করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পিসে থেতলে মৃত্যুবরণ করবে জাফর হুসাইন তাতে কোন সন্দেহ নাই।

বিমানখানা যখন ফিরু বিমান বন্দরে অবতরণের অনুমতি পেয়ে গেলো, তখন জাফর হুসাইন মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে প্লেনের গোপন খাপটার মধ্যে প্রবেশ করতে। ভাগ্য তার প্রসন্ন বলতে হবে প্লেনখানা অবতরণের জন্য ফিরু বন্দরের আকাশে যখন চক্কর দিচ্ছিলো তখন জাফর হুসাইন কৌশলে তার প্লেনের গোপন খাপটার মধ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হলো।

বিমানখানা অবতরণ করলো ফিরু বন্দরে।

সঙ্গে সঙ্গে বিমান বন্দরের পুলিশ এসে উপস্থিত হলো, কারণ অপরিচিত প্লেন বন্দরে অবতরণ করলে বিমান পুলিশ এদিকে কড়া নজর দেয়।

পুলিশ এলে মিঃ লিয়ন বিমানের পাইলটকে পুলিশের হাতে তুলে দিলো। বিমান হরণ এবং নারী হরণ অভিযোগে সে অপরাধী বিবেচিত হলো।

বিমানের তলদেশ থেকে জাফর হুসাইন সব লক্ষ্য করলো এবং সে নীরবে সেই গোপন খাপটার মধ্যে বসে রইলো। সে জানে এখন বের হলে তার পরিত্রাণ নাই, পুলিশ তাকেও গ্রেপ্তার করবে।

মিঃ লিয়ন বেশি স্বয়ং দস্যু বনহুর এবার নিজে এসে বসলো পাইলট আসনে। অবশ্য কিছুক্ষণ বিলম্ব করলো সে ফিরু বিমান বন্দরে। কিছু খাবার এবং পানি নিলো সে কারণ বিমান খানায় এ সব কিছু ছিলো না।

এবার বনহুরের প্লেনখানা ফিরু বিমান বন্দর ছেড়ে আকাশে উড়লো। নাসিমার দু'চোখে বিস্ময়, সে ভাবতেও পারেনি এ ব্যক্তি বিমান চালাতে পারবে। দক্ষ পাইলটের মত বিমানখানাকে চালিয়ে নিয়ে লাহোর অভিমুখে যাত্রা করলো। লাহোর বিমান বন্দরে পৌঁছে নাসিমাকে রহমান বা কাওসার দ্বারা পাকিস্তানের বাইরে পাঠাবার ব্যবস্থা করবে এটাই তার উদ্দেশ্য।

ফিরে চললো বনহুর লাহোরের দিকে। এবার সে কতকটা নিশ্চিন্ত হয়েছে দুটো শয়তানকে খতম করতে সক্ষম হয়েছে বলে অনেকটা আনন্দ উপভোগ করছে সে। জানেনা বনহুর প্রধান শত্রু তার নির্মূল হয়নি এবং সে এই প্লেনেই ফিরে চলেছে।

লাহোর বিমান বন্দরে পৌঁছতে মাত্র কয়েক ঘন্টা লেগে গেলো। বনহুর নাসিমাকে নিয়ে ফিরে এলো নতুন এক হোটেলে। ছোট হোটেল কিন্তু বেশ সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন।

বনহুর আর নাসিমা যখন লাহোর বিমান বন্দর থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে যায় তখন বিমানটির তলদেশে গোপন খাপটার মধ্য থেকে বেরিয়ে সব লক্ষ্য করে জাফর হুসাইন। নাজেহাল পেরেশান অবস্থা বলে সে তাকেই মুহূর্তে ফলো করতে পারেনা তবু আপন মনেই বলে জাফর হুসাইন—যাও যেখানেই থাকো তোমাকে খুঁজে বের করবো নাসিমা। আর তোমাকেও সায়েস্তা করে নেবো আগন্তুক! কে তুমি তাও জেনে নেবো......আপন মনে হাসলো সে কুৎসিৎ বিকৃত সে হাসি।

বনহুর নির্জনে হোটেল কক্ষে পৌঁছে নাসিমাকে লক্ষ্য করে বললো–এখন আপনি নিশ্চিন্ত মিস নাসিমা খান।

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে নাসিমা, এই অদ্ভুত মানুষটার অপূর্ব সুন্দর দীপ্ত মুখমন্ডলের দিকে। যতই সে ওকে দেখছে ততই মুগ্ধ বিস্মিত হচ্ছে নাসিমা। ভাবছে কে এ ব্যক্তি আর তাকে এমনভাবে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যই বা কি।

বনহুর নাসিমাকে তার দিকে ডাগর ডাগর আঁখি মেলে তাকিয়ে থাকতে দেখে একটু হেসে বললো–আপনি বুঝি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না?

ছিঃ ও কথা বলবেন না। আপনিই তো আমার রক্ষক। আর আপনি আমাকে প্রথমে তুমি বলেছিলেন এখন আপনি কেনো?

হাসলো বনহুর ঠিক পূর্বের মতই তারপর বললো–তখন আপনি ছিলেন একজন বন্দিনী, আর এখন আপনি স্বাধীন মুক্ত একজন ভদ্র মহিলা তাই......

ও আমি তখন বন্দিনী ছিলাম বলে আমাকে আপনি অবহেলা এবং তুচ্ছ বলে......

নানা ঠিক তা নয় মিস নাসিমা আমি...মানে, মানে...

থাক বুঝেছি আপনি আমাকে ঘৃণার চোখে দেখেন তাই না?

আপনি ভুল বুঝছেন মিস নাসিমা।

একটা প্রশ্নের সঠিক জবাব দেবেন?

হাঁ এখন আমি আস্বস্ত বিশেষ করে আপনার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত আমি।

সত্যি আপনি কে জানিনা কিন্তু আমার জন্য আপনার এতো সহানুভূতি......

যাক বলুন আপনি কি একটা প্রশ্ন করবেন বলছিলেন মিস নাসিমা?

একটা নয় অনেকগুলো প্রশ্ন আমি করবো, কারণ প্রশ্নগুলো আমার বুকের মধ্যে বড় চাপ বেধে উঠেছে।

বেশ যত খুশি প্রশ্ন করুন। একটা সোফায় বসে পড়ে বনহুর।

নাসিমা বলে–আপনার কপাল দিয়ে রক্ত ঝরছে আমি মুছে দিই।

ও কিছু না।

নানা আপনি চুপ করে থাকুন আগে রক্ত মুছে দিই। পরে আমি সব প্রশ্ন করবো। নাসিমা নিজের আঁচলে বনহুরের কপালের রক্ত মুছে দিতে লাগলো অতি যত্ন সহকারে।

বনহুর বললো–মিস নাসিমা আপনি যে ভাবে আমার যত্ন নিচ্ছেন তাতে সত্যি আমি অভিভূত হচ্ছি। কিন্তু আপনি আমাকে কি করে এতো বিশ্বাস করতে পারছেন? আমিও তো আপনাকে কু'মতলব নিয়ে এখানে নিয়ে আসতে পারি?

নাসিমা বনহুরের কপালের রক্তগুলো মুছে নিয়ে হেসে বলে–আপনার চোখ মুখ বলছে আপনি নর পশু নন......

কিন্তু আপনি ভুল করছেন নাসিমা খান। কারণ আমাকে আপনি যত ভদ্র মহৎ বলে মনে করছেন, আসলে আমি এসব মোটেই নই। তবে আমার দ্বারা আপনার কোন অনিষ্ট হবে না এটুকু বিশ্বাস আপনি আমার উপর রাখতে পারেন। হাঁ এবার শুরু করুন আপনার প্রশ্ন?

প্রথমে আমি জানতে চাই আপনি কি করে আমার নাম জানলেন? কারণ আপনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত-জন।

আপনি সবগুলো প্রশ্ন শেষ করে নিন–আমি জবাব দেবো।

দ্বিতীয়তঃ আপনি কে কি করে আপনি আমার সন্ধান পেলেন এবং নিজের জীবন বিপন্ন করে আমাকে উদ্ধার করার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

আরও কোন প্রশ্ন বাকি রইলো না তো?

থাকলেও আমি একটা কথা আগে জানতে পারলে খুশি হবো।

বনহুর পকেট থেকে একটা দামী সিগারেট প্যাকেট বের করে একটি সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলো। এক মুখ ধোয়া ছুড়ে দিয়ে বললো–মিস নাসিমা আপনার সাক্ষাৎ লাভের অনেক পূর্বে; আপনার নামের সঙ্গে আমি পরিচিত। আপনার পিতাকে যখন আমি পাকিস্তানীদের বন্দী শিবির থেকে উদ্ধার করে বাংলাদেশ অভিমুখে পাঠাই তখন তিনি কিছুতেই আপনাকে ছাড়া যাবেনা। তিনি পাগলের মত আপনার নাম করে চিৎকার করতে থাকেন। আমি তাকে কথা দেই তাঁর কন্যা নাসিমাকে যেমন করে হোক হানাদারদের কবল থেকে উদ্ধার করবো।

নাসিমার চোখ দুটো আনন্দে উজ্বল হয়ে উঠে চিৎকার করে বলে–আমার আব্বাকে আপনি উদ্ধার করেছেন? আমার আব্বা তা হলে বেঁচে আছেন?

হাঁ আপনার আব্বা বেঁচে আছেন এবং তাঁকে আমি বাংলাদেশ অভিমুখে পাঠিয়ে দিয়েছি।

সত্যি আপনি কত মহৎ কত মহান......

এই হোল আপনার প্রথম প্রশ্নের জবাব দ্বিতীয় হলো আমি কে এবং আপনাকে উদ্ধারের উদ্দেশ্য কি? উদ্ধারের উদ্দেশ্য আপনার বাবাকে কথা দিয়েছিলাম তা রক্ষা করলাম। আর আমার পরিচয় আমি একজন মানুষ এবং আমি একজন বাঙ্গালী। এবার তো সব প্রশ্নের জবাব পেয়েছেন নিশ্চয়ই খুশি হয়েছেন আপনি?

হাঁ সব চেয়ে বেশি খুশি হয়েছি আপনি আমার বৃদ্ধ আব্বাকে রক্ষা করেছেন। আরও খুশি হলাম আপনি বাঙ্গালী বলে। তবু আর একটু জানতে চাই কি বলে আপনাকে আমি ডাকবো?

আপাততঃ মিঃ লিয়ন বলেই ডাকবেন।

ও নাম আমার কাছে ভাল লাগেনা।

জানি ও নাম আপনার কাছে ভাল লাগবেনা কারণ মিঃ লিয়ন তো মরে গেছে।

মরে গেছে? অবাক হয়ে তাকায় নাসিমা বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর কয়েক মুখ ধূয়াঁ ছেড়ে বলে–সে এক কাহিনী।

আমি শুনতে চাই, আপনি বলুন?

মিঃ লিয়ন মাত্র কয়েক দিন আগেও হোটেল গুলবাগে থাকতো। একদিন গভীর রাতে সে যমদূতের হাতে নিহত হয়। থামলো বনহুর।

বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বলে উঠে নাসিমা–আপনি যে বললেন–

হাঁ আমিই সেই নিহত মিঃ লিয়ন।

আপনি?

হাঁ!

আপনি তাহলে......

সেদিন আমাকে হত্যা করা হলেও আমি মরি নাই এবং আপনি তা বেশ বুঝতে পারছেন। যমদূত নাম ধারণকারী যে ব্যক্তি আমাকে হত্যা করার জন্য আমার ক্যাবিনে প্রবেশ করেছিলো সে ব্যক্তি এক বিরাট ধন কুবের। আমাকে সে বিষ নজরে দেখছিলো কারণ আমি থাকায় তার ব্যবসায় চরম ক্ষতি হয়েছিলো আর সেই কারণেই আমাকে হত্যা করেছিলো আর একজনকে। সে ছিলো আর একজন শয়তান তাদেরী দলের লোক। পরদিন অবশ্য কোন লাশ মিঃ লিয়নের কক্ষে দেখা যায়নি কারণ লাশটা আমি নিজেই সরিয়ে ফেলেছিলাম। শুধু চাপ চাপ রক্ত জমাট বেঁধে ছিলো লিয়নের বিছানায়।

তারপর?

তারপর পুলিশ এসেছিলো এবং অন্যান্য অনেকেই এসেছিলো সেই ক্যাবিনে তার মধ্যে নিহত মিঃ লিয়ন মানে আমিও ছিলাম।

আপনি ছিলেন?

হাঁ।

কেউ আপনাকে চিনতে পারলোনা?

আমি হোটেল গুলবাগের একজন বৃদ্ধ বয়ের বেশে ছিলাম, তাই আমাকে কেউ চিনতে পারেনি সেদিন। যে হত্যাকারী সেও ছিলো সেই ক্যাবিনে......

সেই যমদূত?

হাঁ, কেউ তাকে না চিনলেও আমার চোখে সে ধূলো দিতে পারেনি যদিও সে সাধু সেজে মিঃ লিয়নের জন্য অনেক দুঃখ প্রকাশ করেছিলো।

আপনি তাকে চিনেও......

না ক্ষমা আমি তাকে করিনি অবশ্য সেদিন ছেড়ে দিলেও পরে তাকে আমি উপযুক্ত সাজা দিয়েছি।

যমদূত তা হলে......

হাঁ সে আর কোন দিন আসবে না। কথাটা শেষ করে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করলো বনহুর।

নাসিমা কিছুক্ষণ নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো তারপর বললো–সত্যি আপনি বড় অদ্ভুত মানুষ। আমার কিন্তু বড় আশ্চর্য মনে হচ্ছে আপনার চালচলন।

হাসল বনহুর–কেনো?

জানিনা আপনাকে দেখে অবধি আপনার সম্বন্ধে আমার মনে বিস্ময়ের অন্ত নাই। আপনাকে যত দেখছি ততই আমি স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি।

হয়তো আমি একটা অদ্ভুত জীবন।

নাসিমা একটু হাসলো কোন জবাব দিলো না।

বনহুর কিছু সময় এক মনে সিগারেট পান করলো তারপর হাতের সিগারেটটা এ্যাসট্রেতে নিক্ষেপ করে সোজা হয়ে বসলো, মনে মনে কিছু চিন্তা করে বললো–মিস নাসিমা যদিও আপনি এখন মুক্ত তবু আপনাকে এখানে খুব সাবধানে থাকতে হবে। কারণ আপনি এখনও বিপদমুক্ত নন।

আপনাকে আমি যতদিন পাকিস্তানের বাইরে পাঠাতে না পেরেছি ততদিন আমিও নিশ্চিন্ত নই।

আমার জন্য আপনার চিন্তার অন্ত নাই। তবে এটুকু জেনে রাখুন পাকিস্তানে আপনাকে একা ছেড়ে আমিও কোথাও যাবো না। পালাতে হয় দু'জনাই পালাবো কারণ আমি জানি পাকিস্তানে আপনারও বহু শত্রু রয়েছে।

তা অবশ্য স্বাভাবিক। একটু থেমে বললো আবার বনহুর–শুধু আমার শত্রু নয় মিস নাসিমা পাকিস্তানের যত বাঙ্গালী আছে তাদের সবার অবস্থা বড় করুন বড় মর্মান্তিক তারা প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর জন্য প্রতিক্ষা করছে। পাকিস্তানি নরপশুরা বাঙ্গালীদের পরম শত্রু তাতে কোন সন্দেহ নাই। যেমন করে হোক এদের আমি উদ্ধার করবোই......

ঠিক ঐ মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করে রুদ্র মূর্তি জাফর হুসাইন, হাতে তার সূতীক্ষ্ণ বিরাট একটা ছোরা।

বনহুর এবং মিস নাসিমা ভূত-দেখার মতই চমকে উঠে। বনহুর তাকে প্লেন থেকে ইরান সাগরে ফেলে দিয়েছিলো সেই শয়তান এখানে এলো কি করে।

বনহুর ধীরে ধীরে সোফা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো।

নাসিমাও দু'চোখে ভয় ভীতি আর বিস্ময় নিয়ে ওঠে দাঁড়ালো।

বনহুর সোফা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে জাফর হুসাইন হিংস্র জানোয়ারের মত ঝাপিয়ে পড়লো তার উপর।

মুহূর্তে বনহুর সরে দাঁড়ালো।

জাফর হুসাইন পড়ে গেলো হুমড়ি খেয়ে মাটির মধ্যে।

বনহুর কালবিলম্ব না করে লাফিয়ে পড়লো, বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরলো জাফর হুসাইনের ডান হাতখানা। ছোরাটা তখন ধরা আছে জাফর হুসাইনের হাতের মুঠায়। বনহুর খুব জোরে জোরে চাপ দিতে লাগলো যেন ওর হাতের মুঠা থেকে ছোরাখানা খসে পড়ে।

নাসিমা একটু পূর্বেই মনে মনে ভাবছিলো নরপশু দুটো খতম হয়েছে। শুধু নাসিমাই নয় বনহুর জানতো সে ঐ দু'টো শয়তানকে চিরদিনের জন্য পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছে। এক্ষণে সেই শয়তান জীবন্ত অবস্থায় এলো কোথা থেকে। কিন্তু সে সব কথা এখন ভাববার সময় নেই। কি করে নরশয়তানটার কবল থেকে উদ্ধার পাবে ভাবতে থাকে নাসিমা।

অনেক কষ্টে বনহুর ওর হাত থেকে ছোরাখানা খুলে ফেলতে সক্ষম হলো। এবার শুরু হলো প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি, যেমন প্লেনের মধ্যে হয়েছিলো।

বনহুরের এক এক বজ্রমুষ্ঠিতে ধরাশায়ী হলো জাফর হুসাইন কিন্তু পরক্ষণেই আবার সে বীর বিক্রমে আক্রমণ করলো বনহুরকে।

জাফর হুসাইন এক সময় চট করে ছোরাখানা তুলে নিলো হাতে, কঠিন কণ্ঠে দাঁতে দাঁত পিষে বললো সে বনহুরকে লক্ষ্য করে—ওঃ ভেবেছিলো আমাদের দু'জনাকে হত্যা করে মিস নাসিমাকে আত্মসাৎ করবে। একা একা ভোগ করবে ও'কে, কিন্তু তা হবেনা......ছোরাসহ এগুতে থাকে জাফর হুসাইন।

বনহুর পিছু হটতে থাকে। সমস্ত মুখমন্ডলে তার একটা কঠিন ভাব ফুটে উঠেছে। হাত দু'খানা প্রসারিত সম্মুখের দিকে। হাত দু'খানার মাংসপেশীগুলো লৌহ ইস্পাতের মত শক্ত হয়ে উঠেছে; পিছু হটলেও সে এতোটুকু ভীত বা সঙ্কুচিত হয়নি।

বনহুরকে লক্ষ্য করে হিংস্র শার্দ্দুলের মত এগুচ্ছে জাফর হুসাইন। চোখ দু'টো দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। আবার বললো সে—আমাকে প্লেন থেকে নিক্ষেপ করে ভেবেছিলে তোমার পথ পরিস্কার হয়ে গেছে, কিন্তু জানতে না গর্দ্দভ আমাকে হত্যা করা যত সহজ মনে করেছিলে তত সহজ নয়। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এগুচ্ছে সে।

বনহুর কোন জবাব দিচ্ছেনা সে শুধু সুযোগের জন্য প্রতিক্ষা করছে। কক্ষের আলোক রশ্মিতে জাফর হুসাইনের হাতে ছোরাখানা ঝকমক করছে।

নাসিমা একেবারে হতাশ হয়ে পড়লো এবার আর মিঃ লিয়ন জাফর হুসাইনের ছোরা থেকে নিস্তার পাবে না। মনে মনে সে খোদাকে স্মরণ করতে থাকে।

জাফর হুসাইন এবার ঝাপিয়ে পড়লো বনহুরের উপর। সঙ্গে সঙ্গে বনহুর সরে দাঁড়াতেই জাফর হুসাইন পড়ে গেলো একটি সোফার উপরে। তার হাতের ছোরাখানা আর একটি সোফার উপরে ছিটকে পড়লো।

বমহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে জাফর হুসাইনকে টেনে দাঁড় করালো তারপরে ওর তল পেটে প্রচন্ড এক লাথি দিতেই হুমড়ি খেয়ে আবার পড়ে গেলো।

এবার বনহুর ওর গলার উপর পা রেখে খুব জোরে চাপ দিতে লাগলো।

জাফর হুসাইনের জিভ বেরিয়ে এলো মুখের ভিতর থেকে, একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ বের হচ্ছে। চোখ দুটো বলের মত গোলাকার হয়ে উঠেছে। সে প্রাণপনে চেষ্টা করছে নিজের গলা থেকে পা খানাকে সরে ফেলার কিন্তু কিছুতেই সক্ষম হচ্ছে না। হঠাৎ এক সময় বনহুর একটু পড়ে যায় অমনি শয়তান জাফর হুসাইন এক ধাক্কায় ফেলে দেয় তাঁকে। আবার শুরু হয় ধস্তা-ধস্তির পালা। এবার বনহুর পড়ে যায় মেঝেতে সঙ্গে সঙ্গে জাফর হুসাইন সোফা থেকে ছোরাখানা তুলে নিয়ে ঝাপিয়ে পড়তে যায় বনহুরের উপর। বনহুর মুহূর্তে উঠে দাঁড়ায় এবং প্রচণ্ড এক লাথি দেয় জাফর হুসাইনের ছোরাসহ হাতখানায় অকস্মাৎ অদ্ভুত এক কান্ড ঘটে, ছোরাখানা জাফর হুসাইনের কণ্ঠদেশে সমূলে প্রবেশ করে।

একটা আর্ত চিৎকারের সঙ্গে গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরিয়ে আসে জাফর হুসাইনের গলা থেকে। ফিন্‌কী দিয়ে রক্ত বেরুতে থাকে। ছোরাখানা ঠিক গলার নিচে বিদ্ধ হয়ে ঘাড়ের দিকে বেরিয়ে এসেছে।

বনহুর তখন রীতিমত হাঁপাচ্ছে।

নাসিমার দু'চোখে ভীতি আর বিস্ময়।

জাফর হুসাইনের বিশাল দেহটা তখনও মেঝেতে লুটিয়ে পড়েনি। মাতালের মত দুলছে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। মুখ দিয়েও গল গল করে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

বনহুরের কয়েক জায়গায় সামান্য কেটে গিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। হাতের পিঠে ঠোঁটের রক্ত মুছে ফেলে। তখনও বনহুরের নাক দিয়ে দ্রুত নিশ্বাস বের হচ্ছে। ক্রুদ্ধ ভাব এখনও কাটেনি, সে তাকিয়ে আছে নর পশুটার দিকে।

দু'খানা পায়ের উপর দুলছে জাফর হুসাইনের দেহটা, ছোরাখানা বাট্ বেয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে। আর হলোনা মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো সে এবার মেঝেতে।

নাসিমা ব্যাকুল কণ্ঠে বললো—চলুন আমরা পালিয়ে যাই এক্ষুণি পুলিশ আসতে পারে। চলুন আমরা পালিয়ে যাই......

নাসিমার কথা শেষ হয়না একদল বর্শাধারী শয়তান পাকিস্তানী গুন্ডা বনহুরকে চার পাশ থেকে ঘিরে ফেলে।

চিৎকার করে উঠে নাসিমা—সর্বনাশ একি হলো?

বনহুর সেই দন্ডে এক ঝটকায় একটা বর্শা কেড়ে নিয়ে ভীষণভাবে আক্রমণ প্রতিহত করে চললো।

নাসিমার তখন ভয়াবহ অবস্থা।

বনহুর একা, আর একসঙ্গে অন্ততঃপক্ষে গুন্ডাদল পনের ষোল জন হবে। এতোগুলো লোকের সঙ্গে পেরে উঠা এক মহা ব্যাপার। বনহুর কৌশলে কয়েকজনকে ধরাশায়ী করে ফেললো।

বনহুর যখন লড়াই করে চলেছে তখন দু'জন শয়তান নাসিমাকে ধরে বের করে নিয়ে যায়। নাসিমা আর্তনাদ করে উঠে।

বনহুর একবার মাত্র ফিরে তাকিয়ে দেখে নেয়। তারপর প্রচণ্ড একলাফ দিয়ে পার হয়ে আসে গুণ্ডাদলের বেষ্টনী ভেদ করে। যে দু'জন লোক নাসিমাকে টেনে হিচড়ে বাইরে নিয়ে যাচ্ছিলো বনহুর আক্রমণ করে তাদের দু'জনাকে। দু'হাতে দু'জনার জামা ধরে টেনে দাঁড় করিয়েই এক একটা ঘুষি বসিয়ে দেয় নাকে-মুখে পরপর কয়েকটা ঘুষি লাগায় সে রীতিমতভাবে।

লোক দু'টির নাক-মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়লো। পড়ে গেলো ভূতলে।

সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য গুণ্ডাদল বনহুরকে আবার ঘিরে ফেললো। আক্রমণ চালালো ওরা চার পাশ থেকে।

ততক্ষণে নাসিমাকে নিয়ে আবার বেরিয়ে গেছে কয়েকজন গুণ্ডা লোক।

বনহুর একখানা চেয়ার তুলে নিয়ে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে।

তখন বর্শাধারী গুণ্ডাদল দিশেহারা হয়ে পড়ে। ওরা বর্শা ছুড়ছে কিন্তু একটি বর্শাও বনহুরকে স্পর্শ করতে পারেনা। বনহুর চেয়ারখানাকে ঢালরূপে ব্যবহার করতে থাকে।

হঠাৎ চেয়ার খানাকে ছুড়ে দেয় বনহুর গুণ্ডাদলের উপর। চেয়ারের আঘাতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় কয়েকজন গুণ্ডা। সেই মুহূর্তে বনহুর প্রচণ্ড এক লাফে বেরিয়ে যায় গুণ্ডাদলের বেষ্টনী ভেদ করে। বাইরে বেরিয়ে আসতেই বনহুর দেখতে পেলো একটি গাড়ি অদূরে ষ্টার্টের উপর দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকজন শয়তান লোক নাসিমাকে সেই গাড়িখানাতে টেনে তুলে নিলো সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছুটলো উল্কা বেগে!

বনহুর এক নিমিশে ভেবে নিলো তারপর রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটা জীপ গাড়িতে আচমকা লাফ দিয়ে উঠে বসলো। বনহুর সম্মুখের মোটরখানাকে লক্ষ্য করে গাড়ি ছাড়লো।

এদিকে গুণ্ডাদল বনহুরের পিছনে পিছনে কক্ষ হতে বেরিয়ে আসতেই তারা দেখলো তাদের জীপ উধাও হয়ে গেছে। ওরা তখন দিশে হরার মত এদিক সেদিক ছুটো ছুটি করতে লাগলো।

ওদিকে তখন প্রথম গাড়িখানাকে ফলো করে জীপখানা উল্কা গতিতে ছুটে চলেছে। এ পথ সে পথ করে এগুচ্ছে গাড়ি দু'টো।

যে পথে প্রথম গাড়িখানা ছুটে চলেছে সম্পূর্ণ নির্জন বলা চলে। শহরের শেষ প্রান্ত অভিমুখে চলেছে গাড়িখানা তাতে কোন সন্দেহ নাই।

বনহুর এক সময় সম্মুখ গাড়িখানার একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে গেলো। বনহুরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গাড়ি চালানো কোন দক্ষ ড্রাইভারেরও নেই।

বনহুর অল্পক্ষণেই সম্মুখ গাড়িখানার আগে গিয়ে তার গাড়িখানাকে দাঁড় করিয়ে ফেললো। এবার সেই গাড়িখানা থেমে পড়তে বাধ্য হলো।

বনহুর গাড়ি রেখেই নেমে পড়লো।

ততক্ষণে গুণ্ডাদলও গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে। ওরা নাসিমাকে নিয়ে পালাতে চেষ্টা করে।

বনহুর দ্রুত গিয়ে এক এক ঘুষি বসিয়ে দেয় এক এক জনের নাকে-মুখে। সেকি প্রচণ্ড আঘাত। কিছু সময়ের মধ্যেই বনহুরের কাছে নাকানি চুবানি খেয়ে এক এক জন এক এক দিকে পালালো ওরা।

ফিরে এলো বনহুর নাসিমার পাশে।

নাসিমার মুখমণ্ডল অদ্ভুত এক দীপ্তময় প্রভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বনহুর পাশে এসে দাঁড়াতেই নাসিমা ঝাপিয়ে পড়ে তার বুকে, ভুলে যায় সেও তার কেউ নয় একথা।

বনহুরের দেহ তখন ঘামে ভিজে একেবারে চুপসে উঠেছে। ঠোঁটের এক পাশ দিয়ে সামান্য রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। বনহুর নাসিমার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনার সুরে বলে-ভয় নেই আর কোন! চলুন এবার ফেরা যাক;

নাসিমা ভয় বিহ্বল কণ্ঠে বললো-ওখানে আর যাবোনা। ওখানে আর যাবোনা আমি......

তাই তো আমিও ভাবছি ওখানে আর ফিরে যাওয়া ঠিক্ হবেনা। একটু কিছু চিন্তা করলো বনহুর তারপর বললো-আপনি জীপে চেপে বসুন।

নাসিমা চেপে বসলো।

বনহুর ড্রাইভ আসনে বসে ষ্টার্ট দিলো সঙ্গে সঙ্গে গাড়িখানা উল্কা বেগে ছুটে চললো।

কোথায় চলেছে বনহুর কে জানে।

নাসিমা নীরবে বসে থাকলেও তার মনে মুহু মুহু ভাবের পরিবর্তন হচ্ছিলো। বনহুরের প্রতিটি কাজ তাকে বিস্ময়াহত করে তুলছে। লোকটার পরিচয় এখনও সে ভালভাবে জানেনা তবু একটা গভীর বিশ্বাস এবং আস্থা ছিলো নাসিমার ওর উপর।

বনহুর এক মনে গাড়ি চালাচ্ছে। তার জামার কয়েক স্থান ছিঁড়ে ঝুলে পড়েছে। চুল গুলো এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে আছে কপালের চার পাশে। চিবুকের এক জায়গায় কেটে রক্ত বেরুচ্ছে। নাসিমা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। বড় সুন্দর লাগছে বনহুরকে এই মুহূর্তে।

বনহুরের দৃষ্টি সম্মুখে।

গাড়িখানা ছুটে চলেছে।

কোথায় চলেছে নাসিমা জানেনা। গাড়িখানা শহরের পথ ছেড়ে বেরিয়ে এলো নির্জন গ্রাম্য পথে। শুষ্ক প্রান্তরে শুধু বালুকা রাশি খাঁ খাঁ করছে। এ দিকে বেলাও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

উঁচুনীচু মেটো পথ, জীপ না হলে এসব পথে চলা মুস্কিল। বনহুর কৌশলে গাড়ি চালিয়ে চলেছে। এতোক্ষণ নাসিমা বা বনহুরের মধ্যে কোন কথাবার্তা হয়নি।

এবার নাসিমা বললো—কোথায় যাচ্ছেন?

আপাততঃ আপনাকে কোন নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিতে যাচ্ছি।

পাকিস্তানে নিরাপদ আশ্রয় আমার জন্য পাবেন আপনি?

কেনো আপনি কি খোদাকে বিশ্বাস করেন না?

করি। তিনি ছাড়া কেউ নেই যে আমাদের......

তাহলে বিশ্বাস হারাবেন না কোনদিন। খোদা অসীম সাগরের মধ্যেও আপনাকে রক্ষা করতে পারেন।

সেকথা নিতান্ত সত্য তার প্রমাণ আমি নিজে। আমি ভাবতেও পারিনি ঐ শয়তান গুন্ডাদলের হাত থেকে নিস্তার পাবো। খোদার দয়া আর আপনার......

থাক আর বলতে হবেনা। এখন আপনি স্থির হয়ে বসুন, রাস্তা বড় খারাপ তাছাড়া সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

নাসিমা এবার চুপচাপ বসে রইলো।

বনহুর দক্ষ ড্রাইভারের মত গাড়ি চালিয়ে চললো।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর একটা পোড়া বাড়ির সম্মুখে এসে গাড়ি থামলো। চার পাশে জঙ্গল। একটা গভীর নির্জনতায় জায়গাটা থমথম করছে।

হঠাৎ নাসিমার মনে একটু অবিশ্বাসের ছোঁয়া লাগলো। এমন জনহীন জায়গায় এক অজানা অচেনা যুবকের সঙ্গে সে একা......

বনহুর গাড়ি থেকে নামতেই দু'জন বলিষ্ঠ লোক এসে তাকে সসম্মানে সেলুট করলো।

নাসিমার সন্দেহ আরও একটু দানা বাঁধলো। কারণ যারা বনহুরকে সেলুট করলো তারা স্বাভাবিক লোক নয় বেশ বুঝতে পারলো সে।

বনহুর নেমে দাঁড়ালো তারপর বললো–নেমে আসুন মিস নাসিমা।

নাসিমা সঙ্কুচিতভাবে তবুও বসে আছে জীপখানার মধ্যে।

বনহুর বললো আবার–আসুন বিলম্ব করছেন কেনো?

নাসিমা দ্বিধাগ্রস্থ পদক্ষেপে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালো। ভীত দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছে সে লোক দু'টোর দিকে।

অন্ধকারে লোক দু'টোকে ভীষণ চেহারা মনে হচ্ছে।

বনহুর নাসিমাকে লক্ষ্য করে বললো–এরা আমার লোক। আসুন আমার সঙ্গে। বনহুর পা বাড়ালো।

নাসিমা অনুসরণ করলো বনহুরকে। পাশাপাশি এগুতে লাগলো ওরা। লোক দু'জন পিছনে অগ্রসর হলো।

বাড়িখানা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, বহুকালের পুরোন বাড়ি তাতে কোন সন্দেহ নাই।

নাসিমার গা ছম ছম করছে। সে বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে এগুচ্ছে। অন্ধকারে বার বার হোচট খাচ্ছে নাসিমা। বনহুর ওকে বললো–আমার হাত ধরে শক্ত হয়ে চলুন।

নাসিমা বাধ্য হলো বনহুরের হাতখানা ধরতে। যদিও সে লজ্জা সঙ্কোচ অনুভব করছিলো তবু কোন উপায় ছিলোনা তার।

ভাঙ্গাচুরা প্রাণীর ডিংগিয়ে এক সময় একটি কক্ষে প্রবেশ করলো। কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করতেই পিছনে লোক দু'জন দু'টো মশালে আগুন জ্বেলে দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘরখানা আলোকিত হয়ে উঠলো। বাড়িখানা একেবারে ভাঙ্গাচুরা হলেও এ ঘরখানা বেশ ভালই আছে। তবে দেয়ালের চুন বালি খসে পড়েছে সম্পূর্ণ রূপে।

নাসিমা অবাক হলো তাকালো মশালধারী লোক দুটির দিকে।

বনহুরকে লক্ষ্য করে ওরা সসম্মানে দাঁড়িয়ে আছে। বনহুর বললো—কাওসার এই সেই মিস নাসিমা। একে এখানে রাখতে হবে অতি সাবধানে।

কাওসার মাথা নত করে বললো—আচ্ছা।

দেখবে এর যেন কোন অসুবিধা না হয়। একটু থেমে বললো বনহুর রামসিং তুমি সব সময় এখানে থাকবে, কোন সময় বাইরে যাবেনা বুঝলে?

রামসিং বললো—বুঝেছি।

নাসিমা ভীত হয়ে উঠলো, ভাবলো ও যদি চলে যায় তাহলে না জানি আবার কোন বিপদ আসবে তার জন্য। বললো তাই নাসিমা—আপনি চলে গেলে আমি একা একা এখানে থাকতে পারবোনা।

একটু হেসে বললো বনহুর—এরা আমার লোক একথা আপনাকে বলেছি। আমার অনুপস্থিতিতে আপনার কোন অসুবিধা হবে না।

কি জানি কেনো যেন বড্ড ভয় হচ্ছে। আজকের রাতটা অন্ততঃ আপনি......

বেশ তা থাকছি কিন্তু ভোর হবার পূর্বেই আমাকে শহরে ফিরে যেতে হবে। কারণ আপনার মত আরও শত শত বাঙ্গালী নারী পুরুষ পাকিস্তানের নানা বন্দী শিবিরে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছে। তাদের উদ্ধার না করা পর্যন্ত আমার স্বস্তি নাই।

বনহুর কথাটা বলে একটা হাতল ভাঙ্গা-চেয়ারে বসে পড়ে বললো—মিস নাসিমা আপনি এই কক্ষে থাকবেন। ঐ যে চৌকি রয়েছে ওখানে আপনার জন্য শোবার ব্যবস্থা করে দেবে ওরা। রামসিং তুমি এর জন্য কিছু খাবার এনে দাও।

রামসিং মশালটা দেয়ালের ফাটলে গুঁজে রেখে বেরিয়ে গেলো।

বনহুর এবার কাওসারকে লক্ষ্য করে বললো–তুমি এর জন্য বিছানা করে দাও।

কাওসার মশাল রেখে বেরিয়ে গেলো।

বনহুর বললো–বসুন মিস নাসিমা। পাশের চেয়ারখানা দেখিয়ে দিলো বনহুর আংগুল দিয়ে।

নাসিমার চোখে মুখে একটা দ্বিধা ভরা ভাব ফুটে উঠেছে। ধীরে ধীরে চেয়ারখানায় বসে পড়লো সে।

বনহুর একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে এক মুখ ধূঁয়া ছুড়ে বললো আবার–কয়েক দিনের জন্য আপনি এখানে থাকবেন তারপর আপনাকে আমি বাংলাদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করবো।

নাসিমা বললো–আমি একা কিছুতেই যাবোনা বলেছি।

আপনি আমাকে একটি বার নয় কয়েক বার শত্রুকবল থেকে উদ্ধার করেছেন। আপনি বিপদে থাকবেন আর আমি নিশ্চিন্ত মনে সরে পড়বো......

আপনি পাগলামী করছেন! আমার জন্য কোন চিন্তা করবেন না একদিন বাংলাদেশে ফিরে নিশ্চয়ই দেখা করবো আপনার সঙ্গে।

এমন সময় রামসিং একজন লোকের হাতে কিছু রুটি আর মাংস নিয়ে হাজির হলো।

মাঝখানে একটা টেবিল, খাবারগুলো ঠিক্ মত সাজিয়ে রাখলো সে টেবিলে।

বনহুর বললো–নিন খেয়ে নিন এবার। বনহুর নিজেও খেতে শুরু করলো।

❑

গভীর রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলো নাসিমার। সে চোখ মেলে তাকালো চারিদিকে জমাট অন্ধকার, মশাল দু'টো জ্বলে জ্বলে কখন নিভে গেছে। কেমন যেন গাটা ছম ছম করে উঠলো তার। নির্জন ভাঙ্গা বাড়িতে সে একটি ঘরে একা শুয়ে রয়েছে।

শুয়ে শুয়ে ভাবছে নাসিমা কত কথা হঠাৎ একটি কণ্ঠস্বর ভেসে এলো তার কানে, কিন্তু কথার শব্দগুলো ঠিক্ বুঝতে পারছেনা সে। এতোরাতে কে বা কারা কথা বলছে জানার বাসনা নাসিমার মনে নাড়া দেয়। ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগ করে নেমে দাঁড়ায়, যদিও পা দু'খানা তার কাঁপছে ভয়ে দুঃর্ভাবনায়, তবু এগোয় সে হাতড়ে হাতড়ে। দেয়াল খুঁজে খুঁজে দরজা আবিষ্কার করে নাসিমা তারপর সেই দিক দিয়ে বেরিয়ে আসে সে বাইরে। একটা আলোক রশ্মি দেখতে পায় নাসিমা। কণ্ঠস্বরটাও বেশ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে।

নাসিমা অতি সতর্কভাবে এগিয়ে যায়। কিছুটা এগুতেই দেখতে পায় আর একটি কক্ষ। সেই কক্ষ মধ্যে আলো জ্বলছে।

নাসিমা গিয়ে দাঁড়ায় সেই কক্ষের একটি ভাঙ্গা জানালার পাশে। জানালাটা ভিতর থেকে বন্ধ কিন্তু বেশ ফাঁক রয়েছে।

নাসিমা ভাঙ্গাচুরো জানালাটার ফাঁকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই, নজর পড়লো দীপ্ত উজ্বল সেই বলিষ্ঠ মুখখানার উপর দাঁড়িয়ে আছে বনহুর, তার সম্মুখে সেই দু'টি লোক রামসিং আর কাওসার। আরও দু'জনকে দেখতে পেলো নাসিমা এদের সে পূর্বে দেখেনি। বনহুর এদের লক্ষ্য করেই বললো—রহমান তুমি গুলবাগ হোটেলেই থাকবে। গোপনে সব সংবাদ সংগ্রহ করবে।

ফিরে তাকায় বনহুর অপর জনের দিকে—তোমার কি সংবাদ হারুন?

হারুন সেলুট করে বললো—সর্দার হীরাঝিলে কতকগুলো বাঙ্গালী তরুণী বন্দী আছে।

ভ্রু জোড়া কুঞ্চিত হয়ে উঠে বনহুরের, বলে সে—হীরাঝিলে বাঙ্গালী তরুণী আটক আছে?

হাঁ সর্দার!

নাসিমার দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠলো, যে তাকে বার বার শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করেছে সে সাধারণ লোক নয়। নিশ্চয়ই কোন, কোন দলপতি বা নেতা হবে। নাসিমার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো। এ পৃথিবীতে এমন কত ব্যক্তি আছেন যারা পরের জন্য নিজেদের বিলিয়ে দিতে পারেন। অনেকে আপন স্বার্থ নিয়ে চলে কিন্তু এই লোকটাকে সে-দেখেছে নতুন

একরূপে। এ যেন মানুষ নয় কোন ফেরেস্তা হবে। এতো সুন্দর চেহারা তেমনি তার কার্যকলাপ। তেমনি অদ্ভুত শক্তির অধিকারী......

নাসিমার চিন্তা তার হাল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বনহুরের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি হয়–হারুন, আমি এই হীরাঝিলের মালিক জাফর হুসাইনকে খতম করতে সক্ষম হয়েছি। নাসিমাকে উদ্ধার করতে পেরেছি। নাসিমা আপাততঃ এখানেই থাকবে। তার যেন কোন অসুবিধা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখবে রামসিং আর কাওসার।

রহমান বলে উঠলো–গুলবাগের মালিক মিঃ প্রিন্সও নিখোঁজ আছে সর্দার।

সে আর আসবেনা রহমান তাকেও আমি পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছি।

সর্দার!

হুঁ রহমান?

কিন্তু......

কি বলো?

কিন্তু আমি জানতাম সে কোথাও আত্মগোপন করে আছে।

না তাকে নিঃশেষ করে দিয়েছি। মিস নাসিমার পিছনে মিঃ প্রিন্স এবং জাফর হুসাইন এরা দু'জনা লেগেছিলো। ওকে নিয়ে ওরা ছিনিমিনি শুরু করছিলো। আমি ওদের খতম করে মিস নাসিমাকে মুক্ত করেছি। একটু থেকে আবার বলে বনহুর–তোমরা প্রস্তুত থেকো কাল আমি হীরাঝিলে রওয়ানা দেবো। যতক্ষণ না হীরাঝিলের বাঙ্গালী বন্দীদের মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছি ততক্ষণ আমি অন্য কোন কাজে যোগ দেবোনা।

নাসিমার হৃদয় ভরে উঠে অনাবিল এক আনন্দে। নির্নিমেশ নয়নে তাকিয়ে থাকে সে ভাঙ্গা জানালার ফাঁকে সেই দীপ্ত উজ্বল সুন্দর বলিষ্ঠ মুখখানার দিকে।

এক সময় ফিরে আসে নাসিমা আবার তার সেই অন্ধকারময় ঘরখানায়। হাতড়ে হাতড়ে শয্যা গ্রহণ করে কিন্তু সমস্ত মনখানা জুড়ে ঐ একটি মুখ, ঐ একটি বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। বনহুরের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে নাসিমা।

ভোর হয়ে গেছে তবু ঘুম ভাঙ্গেনি নাসিমার। বনহুর সেই কক্ষে প্রবেশ করে, সে ভেবেছিলো নাসিমার হয়তো ঘুম ভেঙ্গে গেছে এতোক্ষণ। কিন্তু তখনও অঘোরে ঘুমাচ্ছে নাসিমা।

নাসিমার উপর বনহুরের দৃষ্টি পড়তেই সহসা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারেনা সে। একটি ডানা কাটা পরি যেন ঘুমিয়ে আছে। একরাশ কালো কোঁকড়ানো চুল ছড়িয়ে আছে বালিশের আশে পাশে। চোখ দুটো মুদিত, রক্তাভ গন্ডটা ভোরের আলোতে আরও রক্তাভ লাগছে। কয়েক গাছা ছোট ছোট চুল এলিয়ে পড়ে আছে নাসিমার কপালে।

বনহুর নিস্পলক নয়নে নাসিমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর নিজের অজ্ঞাতেই তার হাতখানা নত হয়ে আসে, নাসিমার কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিতে যায়, সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠে নাসিমা। চোখ মেলতেই বনহুরকে দেখতে পেয়ে দীপ্ত উজ্বল হয়ে ওঠে নাসিমার মুখমন্ডল।

বনহুর চট্ করে হাত সরিয়ে নেয়না, ধীরে ধীরে নাসিমার কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

নাসিমা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে!

বনহুর হেসে বলে–আপনার সুন্দর ললাটে কৃষ্ণ কালো চুলগুলো বড় বেখাপ্পা লাগছিলো তাই সরিয়ে দিলাম।

নাসিমার হৃদয়ে তখন এক অপূর্ব আনন্দ উচ্ছাস বয়ে চলেছে। কি জবাব দেবে, ভাষা যেন হারিয়ে ফেলেছে সে।

বনহুর বললো–আচ্ছা এবার তাহলে চলি মিস নাসিমা।

একটু বসুন না আমার পাশে! বললো নাসিমা।

বনহুর নাসিমার কথা ফেলতে পারলোনা, বসলো।

নাসিমা বললো–সেদিন একটি কথার জবাব এখনও পাইনি কিন্তু!

কি কথার জবাব এখনও পাননি বলুন?

আপনার আসল পরিচয় আপনি এখনও আমার কাছে গোপন করে আছেন। বলুন সত্যি কিনা? নাসিমা তখন শয্যা ত্যাগ করে বিছানায় উঠে বসেছে। আবার বললো নাসিমা–কেনো আমার কাছে নিজকে এভাবে লুকিয়ে রাখছেন? আমি জানি আপনি মিঃ লিয়ন নন।

বনহুর হঠাৎ হেসে উঠলো অদ্ভুতভাবে–হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ......

নাসিমা বিস্ময় ভরা চোখে তাকায় এমন করে হাসতে সে কাউকে কোনদিন দেখেনি। এ হাসি স্বাভাবিক নয়, নাসিমা অবাক হয়ে যায়।

বনহুর হাসি থামিয়ে বলে–সত্যি মিস নাসিমা মিঃ লিয়ন আমার নিজস্ব নাম নয়। এ নাম খানা আমি হোটেল গুলবাগের জন্য ধার করেছিলাম। বনহুর একটা সিগারেট বের করে নিয়ে তাতে অগ্নি সংযোগ করলো তারপর বললো–আমার আসল পরিচয় পেলে আমাকে আপনি ভূতের মত ভয় করবেন। তার চেয়ে আমাকে আপনি যা খুশি তাই বলে ডাকতে পারেন। যেমন ধরুন হাসান, সেলিম, আলম যা আপনার ভাল লাগে......

অভিমান ভরা গলায় বললো নাসিমা–ওসব নকল নামে আমি আপনাকে ডাকতে চাইনা।

তবে যা আপনার ভাল লাগে সেই নামে ডাকবেন। কথার ফাঁকে সিগারেট থেকে ধূয়া নির্গত করে বনহুর।

না তাতে আমি তৃপ্তি পাবোনা। আপনি আমার এতোখানি উপকার করেছেন যার কোন তুলনা হয়না। আমি চিরদিন আপনার কাছে ঋণী থাকবো অথচ আপনার আসল পরিচয় আমি পাবোনা! এর চেয়ে দুঃখ বেদনা আর কিছু নেই।

বলেছি আমার আসল পরিচয় পেলে আপনি কিছুতেই আমাকে সহ্য করতে পারবেন না। আমাকে দূরে সরিয়ে দেবেন মন থেকে......

আমি কোন কথাই আপনার শুনতে চাইনা। বলতে হবে আপনার পরিচয়?

বেশ তাহলে শুনুন, আমি একজন ডাকাত!

মানে?

মানে লোকের মাথায় আঘাত করে তার যথা সর্বস্ব কেড়ে নেওয়া আমার কাজ।

বিশ্বাস করি না।

তাহলে আমি নিরুপায় মিস নাসিমা।

আপনি ডাকাত হতে পারেন না।

হাঃ হাঃ হাঃ ডাকাত বুঝি মানুষ নয়?

কিন্তু তারা মহৎ হয় না।

কারণ?

কারণ তারা হৃদয় হীন নরপশু......

বনহুর নাসিমার মুখে হাত চাপা দেয়–সবাই নয় মিস নাসিমা। ডাকাত হলেই সে নর পশু বা হৃদয় হীন হবে এ কথা ভুল। তবে হাঁ সবার মধ্যেই মানুষ আর অমানুষ আছে। আমিও তাই ঠিক্ নরপশু নই......মিস নাসিমা আপনি যখন আমার নাম শুনবার জন্য বা আমার পরিচয় জানার জন্য এতো উন্মুখ তখন শুনুন কান্দাই এর দস্যু বনহুরের নাম শুনেছেন কি?

বিস্ময় ভরা অস্ফুট কণ্ঠে বলে নাসিমা–দস্যু বনহুর!

হাঁ!

শুনেছি সে এক ভীষণ দস্যু। হাঙ্গেরী কারাগারে তাকে নাকি আটকে রাখতে পারেনি......

সেই ভীষণ ভয়ঙ্কর দস্যু আমি?

আপনি!

হাঁ।

না না আপনি দস্যু নন। আপনি দস্যু নন......নাসিমার চোখে মুখে একটা ভীত ভাব ফুটে উঠে।

বনহুর বলে–আমি জানতাম আমার আসল পরিচয় পেলে আপনি ঘাবড়ে যাবেন।

আপনি তাহলে দস্যু বনহুর? সত্যিই বলছেন?

বলেছি তো আমি যা বললাম সত্য।

কিন্তু......

দস্যু বনহুর বলে আমাকে আপনার বিশ্বাস হচ্ছেনা? মিস নাসিমা আমার দ্বারা আপনার কোন অনিষ্ট হবেনা, এ কথা পূর্বেও আপনাকে বলেছি আবার বলছি।

নাসিমা নিরব নিস্তব্ধ হয়ে যায়। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে সে বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর নাসিমাকে স্বাভাবিক করার জন্য বলে–মিস নাসিমা আপনি আমাকে হাসান বলে ডাকবেন। কারণ এ নামটা আমার অত্যন্ত প্রিয়।

ঢোক গিলে বললো নাসিমা–আচ্ছা।

এমন সময় রহমান দরজার বাইরে থেকে ডাকলো–আসুন গাড়ি প্রস্তুত।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো–চলি মিস নাসিমা?

নাসিমা শুধু মাথা কাৎ করে সম্মতি জানালো।

বেরিয়ে গেলো বনহুর।

পোড়ো বাড়িখানার সম্মুখে জীপখানা দাঁড়িয়েছিলো, রহমান ড্রাইভ আসনে রয়েছে।

পাশে উঠে বসলো বনহুর চোখে-মুখে তার একটা কঠিন কর্তব্যপূর্ণ ভাব।

বনহুর চেপে বসার সঙ্গে সঙ্গে জীপ ছুটতে শুরু করলো। আবার সেই উচুনীচু মেঠো পথ। দু'পাশে বহু নাম না জানা গাছপালা রয়েছে। মাঝে মাঝে ধূ-ধূ প্রান্তর।

বনহুর যে জীপখানায় চলেছে এই জীপখানা কাল রংএর ছিলো আজ কিন্তু তা নেই। কাল এর রং ছিলো গাঢ় সবুজ আজ সম্পূর্ণ পাল্টে জমকালো রং হয়েছে। জীপের নাম্বারও পাল্টে গেছে তার সঙ্গে সঙ্গে।

কাল যে পথে তারা পোড়ো বাড়িটায় গিয়েছিলো আজ সে পথে গাড়ি ফিরে এলোনা এটা অন্য পথ।

এই মুহূর্তে দু'জনার শরীরে ছিলো একই ড্রেস। বনহুর আর রহমানকে দূর থেকে কেউ খেয়াল করতে পারবে না কে মালিক আর কে ড্রাইভার।

গাড়ি যখন স্পীডে ছুটে চলেছে তখন হঠাৎ একটা গুলি গাড়ির হুড়ে এসে বিদ্ধ হলো।

রহমান এবং বনহুর বুঝতে পারলো কোন দুষ্টো লোক তাদের লক্ষ্য করেছে। গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিলো রহমান। কয়েক হাত যেতে না যেতে আর একটা গুলি ছুটে এলো জীপখানার অভিমুখে।

বনহুর বললো–রহমান শয়তান দল ঠিক্ আমাদের গতি লক্ষ্য করছে। এদের দৃষ্টি এড়িয়ে নাগালের বাইরে চলে যেতে হবে।

হাঁ সর্দার আমি গাড়িখানাকে অল্পক্ষণেই সরিয়ে নিচ্ছি। গাড়ির গতি আরও বাড়িয়ে দিলো রহমান।

ঠিক্ ঐ মুহূর্তে চার পাশ থেকে গুলি আসতে লাগলো। হঠাৎ একটা গুলি এসে বিদ্ধ হলো জীপখানার পিছন চাকায়। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি বসে

গেলো। বনহুর আর রহমান বুঝতে পারলো শত্রু অতি নিকটে রয়েছে, তারাও প্রস্তুত হয়ে নিলো যুদ্ধ করবার জন্য।

অল্পক্ষণেই এক দল দুর্দান্ত চেহারার পাকিস্তানী জোয়ান রাইফেল, মেশিনগান, ছোরা চাকু নিয়ে ঘিরে ফেললো বনহুর আর রহমানকে। যেদিকে তাকাচ্ছে সেই দিকে শয়তান গুণ্ডাদল।

বনহুর মুহূর্তে ভেবে নিলো এখন কি করা দরকার। রহমানকে চুপ থাকার জন্য ইংগিৎ করলো বনহুর কারণ এতোগুলো অস্ত্রধারী লোকের সঙ্গে ওরা দু'জন হঠাৎ করে কোন বিপদ ঘটে যেতে পারে।

শয়তান দলের দলপতির হাতে মেশিনগান ছিলো বললো–হ্যান্ডস আপ্!

বনহুর আর রহমান হাত তুলে গাড়ি থেকে নেমে এলো।

দলপতি এক দন্ড তার মেশিন গানের মুখ বনহুর আর রহমানের দিক থেকে সরিয়ে নিলো না। বনহুর আর রহমানকে ঘিরে ওরা এগিয়ে চললো।

মাঝখানে এগিয়ে চলেছে বনহুর আর রহমান।

বিশ্ববিখ্যাত দস্যু বনহুর সাধারণ বন্দী অবস্থায় লাহোর গ্রাম্য পথ বেয়ে এগিয়ে চলেছে। যাকে হাঙ্গেরী পুলিশ বাহিনী গ্রেপ্তার করে রাখতে পারেনি, যাকে হাঙ্গেরী কারাগার আটকে রাখতে সক্ষম হয়নি সেই কিনা আটক হলো পাকিস্তানী শয়তানদের কাছে।

এগিয়ে চলেছে বনহুর।

রহমান তার পাশে। দু'জনাকে ওরা পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলেছে। কোথায় নিয়ে চলেছে ওরাই জানে।

বেলা বাড়ছে।

মাথার উপর সূর্যতাপ প্রচণ্ডভাবে উত্তাপ ছড়াচ্ছে। ঘামছে বনহুর আর রহমান। বনহুরের সুন্দর বলিষ্ঠ মুখমণ্ডল রক্তাভ হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে রহমান তাকিয়ে দেখছে তার সর্দারকে।

বনহুরের মুখোভাবে কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে না। যেমন স্বাভাবিক ছিল এখনও ঠিক তেমনি রয়েছে। বনহুর আর রহমানের শরীরে একই ধরনের পোশাক।

বেশ কিছু দূর এগুনোর পর হঠাৎ আকাশে লালচে মেঘ দেখা দিলো। মুহূর্তে আকাশ ছেয়ে গেলো।

পাকিস্তানীদের মুখমন্ডলে একটা ভীত ভাব ফুটে উঠলো। কারণ তারা জানে এ মেঘ সাধারণ নয়, ঘূর্ণিঝড়ের পূর্ব লক্ষণ।

তখন তারা যে পথ অতিক্রম করে চলেছিলো সে পথ শুধু বালুকাময় প্রান্তর। কোথাও কোন বাড়ি ঘর বা গাছ পালা ছিলো না।

পাকিস্তানীরা জোরে জোরে পা চালিয়ে চলেছে। মাঝখানে বনহুর আর রহমান।

বেশিদূর আর এগুনো তাদের সম্ভব হলোনা ভীষণভাবে ঘূর্ণিঝড় শুরু হলো। সাঁ সাঁ করে শুকনো বাতাস বয়ে যাচ্ছে। রাশি রাশি বালু এসে এলোপাথারী চোখে-মুখে প্রবেশ করছে।

কে কোথায় হুমড়ি খেয়ে পড়তে লাগলো।

ঐ মুহূর্তে পাকিস্তানী শয়তান দলটির দলপতির মেশিন গান গর্জে উঠলো। সে বনহুর আর রহমানকে লক্ষ্য করে মেশিন গান থেকে গুলি চালালো। মনে করলো ওদের মেরে ফেলাই সমিচীন।

কিন্তু খোদা যাকে রক্ষা করে কেউ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। খান সেনাবাহিনীর দলপতির মেশিন গানের গুলিতে তাদের দলের লোকই নিহত হলো ভীষণ ভাবে।

বনহুর রহমানকে বললো–রহমান মাটিতে শুয়ে পড়ো কেউ আমাদের দেখতে পাচ্ছে না। শীঘ্র শুয়ে পড়ো।

রহমান বনহুরের অনতিদূরে শুয়ে পড়লো।

সঙ্গে সঙ্গে তাদের শরীরের উপর দিয়ে চলে গেলো কয়েক ঝাঁক গুলি। একটু পূর্বে তারা ভূমি শয্যা গ্রহণ না করলে এই মুহূর্তে তারা মৃত্যুবরণ করতো তাতে কোন সন্দেহ নাই।

গুলির ঝাঁক সরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বনহুর উঠে দাঁড়ায়। রহমান দাঁত দিয়ে খুলে দেয় তার হাতের বাঁধন। মুক্ত হয় বনহুর। সে দ্রুত হস্তে রহমানের হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে যে মেশিন গান চালাচ্ছিলো তার উপর। প্রচন্ড ঘূর্ণি ঝড়ের মধ্যে শুরু হয় ভীষণ ধস্তাধস্তি। মেশিন গান কেড়ে নিয়ে দিশেহারার মত বনহুর এলো পাথারী গুলি চালায়।

এদিকে ঝড়ের বেগ আরও বেড়ে গেছে।

ভয়ঙ্করভাবে বালুকারাশি ছুটছে। যে লাশগুলো মাটিতে পড়েছিলো সেগুলো অর্ধেক প্রায় বালুর নিচে ঢাকা পড়ে গেছে।

বনহুর মেশিন গান চালাচ্ছিলো তখন শয়তান দলে যে যেদিকে পারলো ছুটে পালালো কিছু সংখ্যক মৃত্যুবরণ করলো।

এক সময় ঝড় থেমে এলো।

বনহুর আর রহমান এগিয়ে চলেছে। তাদের সমস্ত দেহ বালুতে একাকার হয়ে গেছে। মাথার চুল, কপাল, শরীর জামা কাপড় সব যেন বালুতে বালুকাময়।

রহমান আর বনহুর কারো হাতে কোন বাঁধন নেই মুক্ত তারা। সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু কোনদিকে যাচ্ছে কোথায় যাচ্ছে জানেনা।

ঝড় থেমে যাওয়ায় সূর্যের তাপ পুনরায় প্রখর হয়ে উঠেছে। শুধু বালুর-স্তূপ চারিপাশে। পা থেকে হাটু অবধি বালুর মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। চলতে বড় কষ্ট হচ্ছে বনহুর আর রহমানের। তবু তারা এগুচ্ছে সামনের দিকে।

খর রৌদ্র তেজ ক্রমান্বয়ে কমে এলো, বেলা শেষ হয়ে আসছে। কোথাও লোকালয়ের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেনা তারা। ক্ষধু পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ছে উভয়ে যদিও তার কেউ কোন কথা প্রকাশ করছেনা, কিন্তু উভয়ে উপলব্ধি করছে এ ওর মনোভাব।

সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় অদূরে একটি ছোট্ট চালাঘর দেখা গেলো।

বনহুর বললো–রহমান ঐ দেখো একটি চালা ঘর।

রহমান খুশি ভরা কণ্ঠে বললো–হাঁ সর্দার তাই তো দেখতে পাচ্ছি।

চলো দেখা যাক ওখানে আমাদের জন্য কি রকম পরিস্থিতি অপেক্ষা করছে।

সর্দার জানিনা ওখানে আবার কোন বিপদ আমাদের জন্য ওৎ পেতে আছে কিনা।

এগিয়ে চললো বনহুর আর রহমান সেই ছোট্ট চালাঘরটি লক্ষ্য করে। একটা ক্ষীণ আলোকরশ্মি নজরে পড়লো তাদের। চালা ঘরটির মধ্যে টিপ্ টিপ্ করে আলো জ্বলছে।

অল্প সময়ে তারা এসে পড়লো চালাঘরটির পাশে। ঘরের দরজা অর্ধ খোলা, ভিতরে মিট্ মিট্ করে একটা আলো জ্বলছে। কোন লোকজনের সাড়া পাওয়া গেলোনা বা যাচ্ছে না।

বনহুর দরজার পাশে সরে এসে ডাকলো—কে আছেন একটু বাইরে আসবেন কি?

একবার দু'বার তিনবার।

ভিতর থেকে কোন সাড়া এলোনা।

চতুর্থ বার ডাকলো বনহুর—ভিতরে কে আছেন?

ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো এক বৃদ্ধা। যদিও সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে তবু তারা স্পষ্ট দেখতে পেলো বৃদ্ধার চুলগুলো সম্পূর্ণ সাদা ধপ্ ধপ্ করছে। মুখে দাঁতের চিহ্ন নেই। চোখ দুটো ক্ষুদ্র কিন্তু জ্বলছে মনে হলো।

একখানা মলিন জীর্ণ শীর্ণ শাড়ি পরা। হাতে বাঁকা একখানা লাঠি। চালাঘরের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে অবাক হয়ে তাকালো বনহুর আর রহমানের দিকে।

বনহুর বললো—বুড়ি মা আজ রাতের মত আমাদের একটু জায়গা দিতে হবে। আমরা বিপদে পড়েছি।

বৃদ্ধা জিভ দিয়ে ঠোঁট দু'খানা চেটে নিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বললো—তোমরা বিপদে পড়েছো বাছা! বেশ বেশ এসো আমার চালাঘরে এসো তোমরা।

বৃদ্ধা এবং বনহুরের মধ্যে সম্পূর্ণ উর্দূতে কথাবার্তা হচ্ছিলো। কারণ বনহুর জানতো এদেশে বাঙ্গালী কমই আছে। তাছাড়া এই নির্জন মরুভূমির বুকে বাঙ্গালী বৃদ্ধা আসবেই বা কোথা থেকে।

বৃদ্ধার কথা শুনে রহমান খুশি হয়ে বললো—সর্দার বুড়ি মা খুব ভাল মানুষ বলে মনে হচ্ছে। চলুন আমরা চালাঘরের মধ্যে যাই?

বনহুর বললো—হাঁ বুড়ি মাকে খুব দয়াবতী মেয়ে বলেই মনে হচ্ছে। কথাটা বলে সে পা বাড়ালো চালাঘরটির দিকে।

রহমান বনহুরকে অনুসরণ করলো।

দারোয়ান উঠে আসতেই বৃদ্ধা বললো—তোমরা এখানে বসো। বৃদ্ধা একটা ছেঁড়া কম্বল বিছিয়ে দিলো তাদের বসার জন্য।

রহমান তাকালো সর্দারের দিকে, তিনি বসতে বলে কিনা কিংবা তিনি বসেন কিনা জানার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলো।

বনহুর ইংগিৎ করলো তাকে বসার জন্য এবং নিজেও বসে পড়লো। ক্লান্ত অবশ দেহটা সত্যি সত্যি বড় ভারী লাগছিলো পা দু'খানার উপর।

পা দু'খানা অর্ধ মেলিত অবস্থায় বসলো ওরা।

বৃদ্ধা কিছু বলবার আগেই বললো বনহুর-বুড়ি মা বড্ড পিপাসা, যদি একটু ঠান্ডা পানি খেতে দাও......

পানি খাবে?

হাঁ বুড়ি মা।

তোমরা এখানে বসো আমি পানি নিয়ে আসছি। বৃদ্ধা লাঠিতে ভর করে চালাঘরে প্রবেশ করলো।

বনহুর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে জায়গাটা।

রহমান বললো ফিস ফিস করে-সর্দার বুড়িকে কেমন সন্দেহ হচ্ছে।

ঠোঁটে আংগুল চাপা দিয়ে বললো বনহুর-চুপ!

রহমান বললো-সর্দার চলুন সরে পড়ি?

হুঁ হুঁ চুপ চাপ বসো কিন্তু পানি আনলে চট করে পানি খেওনা যেন।

আচ্ছা সর্দার। আপনিও যেন খাবেন না।

এমন সময় বৃদ্ধা একটি মাটির ভাঁড়ে কিছু পানি নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়। বলে-নাও পানি পান করো বাছা তোমরা।

হাঁ বুড়ি মা পানি পান আমরা করবো কিন্তু গেলাস কই? এক ভাঁড়ে দু'জন কি করে পানি খাবো?

ও তোমরা এক ভাঁড়ে পানি খাবেনা তাহলে? সবুর করো গেলাস নিয়ে আসি।

বৃদ্ধা পুনরায় গেলাস আনতে ঘরে চলে গেলো।

বনহুর অন্ধকারে ভাঁড় থেকে সব পানি দরজার নিচে ঢেলে দিলো তারপর বললো-বুড়িমা-বুড়ি মা গেলাস লাগবে না। আমরা পানি হাতে করে খেয়ে নিয়েছি।

বুড়ি মা আবার বেরিয়ে এলো হেসে হেসে বললো-বেশ করেছো বাছা, তোমরা বেশ করেছো এবার ঘুমাও।

বনহুর বলে উঠলো-এ্যা ঘুমাবো! কিন্তু পেট যে এখনও ক্ষুধায় জ্বলছে কিছু খেতে দেবেনা বুড়ি মা?

হেঃ হেঃ হেঃ হাসলো বুড়ি মা, তারপর বললো-ক্ষুধা! আচ্ছা বাছা এখন ঘুমিয়ে পড়ো তারপর ঘুম ভাঙ্গলে খেতে দেবো।

বুড়ি মা বড্ড ঘুম পাচ্ছে আমার। বললো বনহুর। বার বার হাই তুলতে লাগলো।

রহমান অবাক হয়ে গেছে হঠাৎ সর্দারের কথাবার্তা যেন বেখাপ্পা লাগছে। রহমান তাকাচ্ছে বার বার সর্দারের মুখের দিকে।

বনহুর বললো-শুয়ে পড়ো রহমান, শুয়ে পড়ো তোমরা কি ঘুম পাচ্ছেনা?

রহমান সর্দারের বলার ভঙ্গী দেখে বললো-হাঁ-সর্দার ঘুম পাচ্ছে।

তবে শুয়ে পড়ো।

কিন্তু......

বুঝেছি খিদে পেয়েছে।

হাঁ।

বুড়ি মা বলছে ঘুমিয়ে উঠলে-খেতে দেবেন। কথাটা বলে শুয়ে পড়লো বনহুর।

রহমানও শুয়ে পড়লো।

বুড়ি আবার হেঃ হে ঃ করে হাসলো, তারপর চলে গেলো চালা ঘরটার মধ্যে।

বনহুর চাপা কণ্ঠে বললো-রহমান আমরা কোন ভয়ঙ্কর স্থানে এসে পড়েছি। কোন যাদুকরী মায়াবিনীর পাল্লায় পড়েছি বলে মনে হচ্ছে।

তাহলে উপায়? চলুন সর্দার পালিয়ে যাই......

বনহুর ঠোঁটে আংগুল চাপা দিয়ে বলে-চুপ দেখো কি হয়।

সর্দার কেমন যেন পঁচা ভ্যাপ্সা একটা গন্ধ পাচ্ছি।

হাঁ আমিও পাচ্ছি। এ গন্ধ মানুষের পঁচা মাংসের তাতে কোন সন্দেহ নাই।

আমি এ ভাবে শুয়ে থাকতে পারছিনা সর্দার?

কষ্ট করো।

বড্ড ক্ষুধার পিপাসা......

সহ্য করতে হবে।

সর্দার ঘরের মধ্যে বুড়ি কি করছে দেখবো?

তুমি শুয়ে থাকো আমি দেখছি। বনহুর ছেঁড়া কম্বল ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়, দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে ভিতরটা।

ভিতরে দৃষ্টি পড়তেই শিউরে উঠলো বনহুর। চালাঘরের মধ্যে মিট মিটে প্রদীপের আলোতে সে স্পষ্ট দেখতে পেলো একপাশে অনেকগুলো সাদা কোন বস্তু স্তূপাকার করে রাখা হয়েছে। পাশে পড়ে আছে একটি লাশ, কিন্তু দেহটা রক্তাক্ত বলে মনে হলো। আরও বিস্মিত হলো বনহুর বুড়ি রক্তাক্ত দেহটা থেকে কাঁচা মাংস কামড়ে কামড়ে খাচ্ছে। বনহুর জীবনে বহু বীভৎস কাণ্ড দেখেছে, কিন্তু এমন অদ্ভুত ভয়ঙ্কর কান্ড সে দেখেনি। ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখলো বনহুর, ওপাশে সাদা বস্তুর স্তূপ অন্য কিছু নয় মানুষের কঙ্কালের পাহাড়।

বনহুর ফিরে এলো, সব বললো সে রহমানকে সংক্ষেপে। রহমান একজন বীরপুরুষ, একজন দস্যু সে, সর্দারের কথা শুনে ভীত আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। মরতে সে ভয় পায়না কিন্তু এভাবে সে মরতে চায়না। বললো–চলুন সর্দার আমরা পালিয়ে যাই?

বনহুর বললো–রহমান এ কথা বলোনা। যে রহস্য জালে আটকে পড়েছি, সে রহস্য জাল বিচ্ছিন্ন না করে আমি পালাবোনা। কে এই বৃদ্ধা, আর কি করেই বা সে নরহত্যা করে, আর কেনোই বা সে তা ভক্ষণ করে? সব জানতে হবে বুঝলে?

সর্দার।

জানি, এভাবে আর আমরা কতক্ষণ কাটাতে পারি। কিন্তু শেষ দেখতে চাই, কি ঘটে আমাদের ভাগ্যে। আপাততঃ ক্ষুধা পিপাসার কথা ভুলে যাও রহমান।

আবার বনহুর উঠে পড়লো।

এবার রহমানও তার সঙ্গে এলো।

দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখছে বৃদ্ধার কাণ্ড-কলাপ।

রহমানের তো চক্ষুস্থির, এমন দৃশ্য সে কোনদিন দেখেনি। স্বাভাবিক মানুষ যে মানুষের মাংস কামড়ে কামড়ে খেতে পারে এ যেন সে কিছুতেই ভাবতে পারছেনা। বনহুর চাপা গলায় বললো—ঐ লাশটা শেষ করে তারপর আমাদের পালা। এই ধূঁ ধূঁ মরুভূমিতে যে কোন মানুষ পথ ভুল করে এখানে এসে পড়ে, তাকেই এই যাদুকরী মায়াবিনী হত্যা করে তার মাংস ভক্ষণ করে। ঐ দেখো নর কঙ্কালের স্তূপ......

রহমান বিস্ময় ভরা চোখে দেখছে।

বনহুর বললো—ঐ সব নর কঙ্কাল থেকেই পঁচা ভ্যাপসা গন্ধ আসছে। আমাদের যে পানি বৃদ্ধা পান করতে দিয়েছিলো সে পানি সচ্ছ পানি ছিলোনা। ঐ পানি পান করলেই আমরা চির নিদ্রায় অচেতন হয়ে পড়তাম। আর কোন দিন আমাদের ঘুম ভাংতোনা।

সর্দার।

হাঁ আমাদের মৃত্যু ঘটতো এবং আমাদের মৃত দেহগুলো সে ইচ্ছামত ভক্ষণ করতো।

সর্বনাশ......

ভয় নেই আমি বৃদ্ধাকে সে সুযোগ দেবোনা।

কিন্তু......সে যে মায়াবিনী যদি কিছু করে বসে।

এতো ভীত হওয়া তোমার সাজেনা রহমান। সব মায়াজাল আমি বিচ্ছিন্ন করবো। বনহুর কথাটা বলে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করতে উদ্যত হলো ঠিক্ ঐ মুহূর্তে দরজা আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গেলো। চারিদিকে শুধু অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নজের পড়ছেনা।

বনহুর এবং রহমান আশ্চর্য হয়ে গেলো।

বনহুর শুধু দরজার চৌকাঠে পা রাখতেই হঠাৎ তাদের সম্মুখে বিস্ময় করভাবে দরজা বন্ধ হয়ে গেলো কেনো? বৃদ্ধা তো তখন মৃতদেহ ভক্ষণ করছিলো।

রহমান বললো—চলুন সর্দার আমরা এই স্থান ত্যাগ করি।

বনহুর বললো—যতক্ষণ না ঐ নর খাদক বৃদ্ধাকে খুন করতে সক্ষম হয়েছি, ততক্ষণ আমি এ স্থান ত্যাগ করবোনা। এবার বনহুর প্রচণ্ড ধাক্কা দিতে শুরু করলো চালা ঘরের দরজায়।

কিন্তু আশ্চর্য একটু নড়লোনা দরজাটা।

একবার দু'বার তিনবার তবু দরজা ঠিক পূর্বের মত দাঁড়িয়ে রইলো।

বনহুর বললো–একি কাণ্ড রহমান একটা সামান্য চালাঘরের হাল্কা দরজা অথচ এতো জোরে জোরে ধাক্কা দিয়েও ভাংতে পারছিনা। রহমানও যোগ দিলো বনহুরের সঙ্গে কিন্তু এ যেন এক অদ্ভুত কাণ্ড কিছুতেই দরজাখানা এক চুল নড়াতে পারলোনা তারা।

এদিকে যতই রাত বাড়ছে ক্ষুধা পিপাসায় তাদের গলা শুকিয়ে আসছে। এতো সহজে তারা কাবু হবার লোক নয়, কিন্তু কিছু পূর্বে তাদের ভীষণ লড়াই করতে হয়েছিলো কাজেই এই দণ্ডে বেশ কাহিল লাগছে তাদের।

বনহুর তবু হতাশ হবার লোক নয়।

রহমানও সর্দারের ইচ্ছায় ইচ্ছুক তাতে কোন সন্দেহ নাই। যতক্ষণ না দরজা তারা ভাঙ্গতে সক্ষম হবে ততক্ষণ কিছুতেই ফিরে যাবেনা।

বনহুর আর রহমান পুনরায় দরজায় ধাক্কা দিতে শুরু করলো, কিন্তু এবারও তারা সফল হলোনা।

রহমান বললো–সর্দার এ বুড়ি নিশ্চয়ই যাদুকরী বুড়ি।

হাঁ একথা আমি তোমাকে পূর্বেই বলেছি রহমান, কিন্তু আমি কোন যাদু বিশ্বাস করি না। আমি এ দরজা ভাঙ্গবোই এবং নর খাদক বুড়িকে হত্যা করবোই করবো।

রহমান সর্দারকে শপথ গ্রহণ করতে দেখে একটু ভীত হলো, সে বললো–সর্দার যাদু জিনিসটা অতি ভয়ঙ্কর জিনিস। এখানে কোন শক্তি খাটে না।

বনহুর অদ্ভূতভাবে হেসে উঠলো–হাঃ হাঃ হাঃ যাদু! যাদুকে তুমি বিশ্বাস করো রহমান?

সর্দার!

বুঝেছি তুমি ভীত হয়ে পড়েছো কিন্তু মনে রেখো রহমান যতক্ষণ না আমি এই বুড়ি ডাইনীর যাদু জাল ভেংগে চুরমার করতে পেরেছি, ততক্ষণ স্বস্তি পাবোনা, আবার হেসে উঠলো বনহুর। তার হাসির শব্দে জমাট অন্ধকার যেন খান খান হয়ে ভেংগে পড়ছিলো।

হঠাৎ বনহুরের হাসি যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো! রহমান বিস্ময় ভরা চোখে দেখলো বনহুর যেখানে দাঁড়িয়েছিলো সেখানে নাই। অন্ধকারে ভাল করে তাকালো সে চারদিকে, কিন্তু কিছুই নজরে পড়লো না। মুহূর্তে রহমানের বুকটা ধক্ করে উঠলো, তবে কি সর্দারকে মায়াবিনী বৃদ্ধ ধরে নিয়ে গেছে। কিন্তু কি করে তা সম্ভব। হলোই বা অন্ধকার তবু তো সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো তার সর্দারকে।

রহমান ক্ষুধা পিপাসার কথা ভুলে যায়, সর্দার অদৃশ্য হওয়ায় সে নিরুপায়ের মত তাকায় চারিদিকে। কোথাও কোন শব্দ নাই, কোথাও কোন জন মানব নাই শুধু অন্ধকারময় রাজ্য।

রহমান কি করবে ভেবে পায়না, সে এখানে অন্ধকারে মাথা ঠুকে রোদন করলেও কোন ফল হবে না। তবু চিৎকার করে ডাকলো রহমান—সর্দার,......সর্দার......সর্দার......

প্রতিধ্বনি ফিরে এলো কিন্তু সর্দারের কোন জবাব এলো না।

বার বার ডাকলো রহমান, ভাবলো তাকেও যদি সর্দারের কাছে নিয়ে যায় তাহলে উভয়ে এক জায়গায় থাকতে পারবে। সর্দারের ভাগ্যে যা ঘটে তার ভাগ্যেও তাই ঘটবে। কিন্তু রহমানের আশা সফল হলো না।

এক সময় তার মনে নানা চিন্তার উদয় হলো। ভাবলো সে ফিরে যাবে, সেই পোড়া বাড়িতে, যেখানে আছে রামাসিং কাওসার আর হারুন। গিয়ে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করবে। পাকিস্তানে এসে শেষ পর্যন্ত সর্দারকে হারাবে তারা। না না তা হবেনা, পর্দারকে হারালে তারা কোন মুখ নিয়ে ফিরে যাবে কান্দাই আস্তানায়। রহমানের মনের পর্দায় পর পর ভেসে উঠলো কয়েকখানা মুখ, মরিয়ম বেগমের শোকাতুরা করুন চেহারা। মনিরার সেই ব্যথা ভরা মুখচ্ছবি। নূরীর প্রেমময় মুখখানা, নূর আর জাভেদের শিশু মুখ......না না এদের মধ্যে সে ফিরে যেতে পারবে না। কি জবাব দেবে সে তাদের কাছে।

রহমান ছুটতে শুরু করলো, অন্ধকারে দিশেহারার মত সে চলেছে সেই পোড়ো বাড়িখানার উদ্দেশ্যে। কিন্তু কোথায় কোনদিকে সে বাড়ি, এই গভীর রাতে জমাট অন্ধকারে চিনবে কি করে। তবু এগিয়ে চলেছে, ক্ষুধা পিপাসায় কণ্ঠ শুকিয়ে এসেছে পা দু'খানা আর উঠতে চাচ্ছে না।

চলেছে তো চলেছে ধূঁ ধূঁ প্রান্তরের যেন শেষ নাই। পা দু'খানা বালির মধ্যে বসে যাচ্ছে, টেনে টেনে পথ চলছে সে।

এক সময় ভোর হয়ে এলো।

হঠাৎ রহমানের নজর পড়লো দূরে একটি ভাঙ্গা চুড়ো বাড়ি কতকগুলো ঝোপ ঝাড়ও দেখতে পাচ্ছে সে।

রহমান সেইদিকে এগিয়ে চললো।

যতই নিকটবর্তী হচ্ছে ততই সে বুঝতে পারলো এই সেই পোড়ো বাড়ি, এটাই তাদের আস্তানা। পিছন থেকে বাড়িখানাকে সে ভালভাবে চিনতে পারেনি। সে যে ঠিক্ পথে এসে গেছে এ জন্য খোদাকে অশেষ ধন্যবাদ জানালো রহমান। রাতের অন্ধকারে সে তো কোন পথ চিনতে পারেনি, জানতোও না সে কোন পথে কোথায় চলেছে।

রহমান যখন পৌঁছলো তখন তার অবস্থা দেখে এবং তার কাছে সব কথা শুনে রামসিং কাওসার ও হারুন হতভম্ভ হয়ে পড়লো।

এক সময় নাসিমার কানেও গেলো কথাটা। তার হৃদয়ে প্রচণ্ড আঘাত লাগলো, যে তাকে বার বার বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে আর সেই কিনা আজ মহা বিপদে পড়েছে। বিশ্ব-বিখ্যাত দস্যু বনহুর আজ রহস্যপূর্ণভাবে উধাও। এ কথা যেন নাসিমার বিশ্বাসই হতে চাচ্ছিল না। হাঙ্গেরী কারাগার যাকে আটকে রাখতে পারেনি। সেই মহাশক্তিকে আটকে রাখবে কোন যাদুকরী। নাসিমা বেরিয়ে এলো রহমান রামসিং ও কাওসারের সম্মুখে। বললো সে—আপনারা মুহূর্ত বিলম্ব করবেন না। চলে যান, এই দণ্ডে চলে যান নিশ্চয়ই সেই চালা-ঘরের মধ্যে সে আছে। তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমারও আছে আমিও যাবো আপনাদের সঙ্গে।

রহমান বললো—আপনি ভদ্র মহিলা সে কষ্ট আপনি সহ্য করতে পারবেন না। আপনি বরং এখানে থাকুন এবং প্রতিক্ষা করুন তাঁকে যেন ফিরে আনতে পারি। হারুন থাকবে, আপনার যেন কোন বিপদ না ঘটে সেজন্য সে কড়া পাহারা দেবে।

নাসিমা প্রায় কেঁদেই ফেললো, বনহুরের প্রতি তার একটা গভীর ভালবাসা জন্মে গিয়েছিলো। তাকে বড় আপনজন মনে হচ্ছিলো নাসিমার

এই দুর্যোগময় সময়ে, সেই আপন জনই আজ হারিয়ে গেছে, নাসিমার চোখে পানি এসে যায়।

রহমান রামসিং আর কাওসার হারুনকে পোড়ো বাড়িতে নাসিমার পাহারায় রেখে বেরিয়ে যায়। আবার সেই চালা ঘরের উদ্দেশ্যে চলে তারা।

❑

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এলো বনহুরের। চোখ মেলে তাকালো সে চারিদিকে। এখন কোথায় সে ভাবতে লাগলো, কিন্তু কিছুতেই কোন কথা মনে পড়ছে না তার। এমন সময় দু'জন বলিষ্ঠ চেহারার লোক এসে দাঁড়ালো বনহুরের শিয়রে।

বনহুর বললো–কে তোমরা? কি চাও তোমরা আমার কাছে?

লোক দু'টো কোন জবাব দিলো না বনহুরের কথায়, তারা বনহুরকে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে ছিল। বনহুরের হাতখানা পিছন থেকে মজবুত করে বাঁধাছিলো কাজেই সে হাত দু'খানা ব্যবহার করতে পারছিলো না।

বনহুরকে লোক দু'জন নিয়ে চললো। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে সে জানে না। বনহুরের মাথা ঝিম ঝিম করছে, কোন কথা সে স্মরণ করতে পারছে না।

এক জায়গায় এনে দাঁড় করালো বনহুরকে।

বনহুর চোখ তুলে তাকালো। চমকে উঠলো সে হঠাৎ তার মনে পড়ে গেলো সব কথা। তাকিয়ে দেখলো সেই বুড়ি, এলোমেলো একরাশ পাকা চুল কোঠারাগত চোখ, দাঁতগুলো নড়বড়ে হলেও আসলে নড়বড়ে নয়। কেমন যেন যাদুকরী চেহারা। কটমট করে তাকালো বনহুরের দিকে সে।

বনহুরের সব কথা মনে পড়লো, রহমান আর সে দাঁড়িয়েছিলো সেই চালা ঘরের ছায়ায়। হঠাৎ দরজা বন্ধ হয়ে গেলো, দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কা দিতে লাগলো। দরজা কিছুতেই খুলতে পারলো না। বার বার ধাক্কা দেওয়ার পর সে আর রহমান অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক ঐ মুহূর্তে কে যেন তাকে পিছন থেকে টেনে নিলো। তারপর আর কিছু মনে নাই। কোথায় গেলো

রহমান, কোথাইবা সে চালা ঘর। যখন হুস হলো দেখলো শুয়ে আছে অন্ধকারময় একটা ঘরের মেঝেতে।

তারপর তো সব দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু কে এই বুড়ি যে শুধু যাদুকরীই নয় রাক্ষসীও বটে। বনহুর নিজের দেহটির দিকে তাকিয়ে দেখলো। জামাটার স্থানে স্থানে রক্তের দাগ লেগে রয়েছে, কোথাও কোথাও ছিঁড়েও গেছে। ক্ষুধা পিপাসা যেন আর নেই। তবে শরীরটা অত্যন্ত ক্লান্ত অবসন্ন মনে হচ্ছে। হাত দু'খানা ওরা কখন পিছমোড়া করে বেঁধেছে জানেনা বনহুর।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো তার দু'পাশে দু'জন দাঁড়িয়ে আছে। একপাশে একটা মশাল জ্বলছে। সম্মুখে দণ্ডায়মান সেই যাদুকরী বৃদ্ধ, দু'চোখে যেন আগুন ঝরে পড়ছে।

বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো বৃদ্ধা—তোমাকে আমি ভক্ষণ করবো না তোমাকে দিয়ে আমার অনেক কাজ হবে। তোমার ললাটে আমি শুভকরী নিদর্শন দেখতে পেয়েছি। লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে তুমি একজন। হেঃ হেঃ হেঃ হাসতে লাগলো বুড়ি।

বনহুরের মনে বিস্ময় জাগলো, তাকে দিয়ে নাকি বুড়ির অনেক কাজ হবে। তাঁকে বুড়ি ভক্ষণ করবে না। তাহলে উপস্থিত সে বেঁচে রইলো। অনেক কথাই স্মরণ হলো তার মনে। বললো বনহুর—আমার হাতের বাঁধন খুলে দাও বুড়ি মা?

বুড়ি বনহুরের কথায় আবার হেসে উঠলো—হেঃ হেঃ হেঃ তোমার হাতের বাঁধন খুলে দিলে তুমি পালাতে চেষ্টা করবে তা হবে না তোমার হাতের বাঁধন কিছুতেই খুলে দেবো না।

তবে আমাকে পানি দাও বুড়ি মা, পিপাসায় গলাটা শুকিয়ে গেছে। কথাগুলো অতি কোমল গলায় বললো বনহুর।

বুড়ির বোধ হয় মায়া হলো, বললো—পানি নিয়ে এসো।

সঙ্গে সঙ্গে একটা লোক গেলাস পানি এনে বুড়ির পাশে দাঁড়ালো।

বুড়ি বললো—ওকে দাও।

লোকটা বনহুরের মুখের কাছে পানির গেলাস তুলে ধরলো।

তখন বনহুরের কিছু ভাববার মত মনের অবস্থা নেই। পিপাসায় তার গোটা বুকটা যেন শুকিয়ে কাঠ বনে গেছে। বনহুর ঢক্ ঢক্ করে সব টুকু

পানি পান করে ফেললো। পানিটুকু যেন তার কাছে অতি মধুর বলে মনে হলো। অনেকটা তৃপ্তি পেলো সে এবার।

বুড়ি বললো–কিছু খাবে তুমি?

হাঁ, খাবো মুড়ি মা।

কি খাবে তুমি?

বুড়িমাকে এমনভাবে কথা বলতে শুনে বাঁচার একটা ক্ষীণ আশা জাগলো তার মনে। নিশ্চয়ই বুড়ি তাকে খেতে দেবে। কিন্তু একি তার শরীরটা যেন দুলছে। দাঁড়াতে পারছেনা আর সে, তবে কি ঐ পানি আসল পানি নয় কোন কিছুর রস? তাই তবে, না হলে অমন মিষ্টিবোধ হবে কেনো? বনহুর বললো–খাবো।

সঙ্গে সঙ্গে বললো বুড়ি– খাবার নিয়ে এসো।

অল্পক্ষণে খাবার এলো। দু'জন বনহুরের হাতের বাঁধন খুলে দিলো, বনহুরের সম্মুখে খাবারের থালাটা রাখলো।

বনহুর মাটিতে বসে খাবারের থালা থেকে ঢাকনা সরিয়ে ফেললো। দেখলো কতকগুলো কাঁচা মাংস স্তূপাকার করে রাখা হয়েছে। মাংস থেকে তখনও রক্ত ঝরছে।

বুড়ি বললো–খাও। তারপর সে চলে গেলো।

লোক দু'জনও চলে গেলো সেখান থেকে।

বনহুর তাকালো মাংসর দিকে পৃথিবীটা যেন দুলচে। বনহুর পারছেনা আর নিজকে সামলে রাখতে। দু'হাতে তুলে নিলো সে মাংস খন্ড। যেমন সে মুখে দিতে যাবে অমনি তার দু'হাত কে যেন চেপে ধরলো–নানা ও মাংস খাবেন না...ও মাংস খাবেন না আপনি......

বনহুর বলে উঠলো–কে, কে তুমি আমাকে মাংস খেতে বারণ করছো?

–সেই কণ্ঠস্বর...আমি...আমি...আমাকে তুমি চিনতে পারছোনা?

–না! বললো বনহুর।

–আবার সেই কণ্ঠ...আমি শাম্মী...

তুমি...তুমি এখানে?

...আমাকে ওরা হত্যা করেছে কিন্তু আমি মরিনি।

তুমি বেঁচে আছো শম্মী?

না।

তবে, তাহলে তুমি বলছো আমি মরিনি?

হাঁ সবার চোখে আমি মরেছি, কিন্তু তোমার কাছে আমি চিরদিন বেঁচে থাকবো। তুমি যে আমার.......

শাম্মী!

হাঁ আমি তোমাকে প্রাণ দিয়ে ভাল বেসেছিলাম, তাই তোমার জন্য আমি মরেও মরতে পারিনি। ও মাংস তুমি খেওনা, ও মাংস নর মাংস।

শাম্মী! শাম্মী......

কিন্তু কোথায় শাম্মী সব যে ফাঁকা। আধো অন্ধকারে তার সম্মুখের থালায় স্তূপাকার মাংস পড়ে রয়েছে।

বনহুর আবার ডাকলো–শাম্মী–শাম্মী কোথায় গেলে তুমি?

আর কোন সাড়া নাই।

অবাক হয়ে যাচ্ছে বনহুর, তবে কি সত্যি সত্যি শম্মী নয়, তার আত্মা তাকে এমন করে অনুসরণ করে ফিরছে। হোটেল গুলবাগে তাকে একদিন এমনি করেই বারণ করেছিলো, ও খাবার আপনি খাবেন না ও খাবার আপনি খাবেন না...মিঃ লিয়ন...আর আজও সে তাকে এমনি করে বারণ করলো। কিন্তু বড্ড যে ক্ষুধা পেয়েছে কি খাবে সে এখন।

আর যে সে বসে থাকতে পারছেনা সমস্ত দেহটা ক্রমান্বয়ে অবশ হয়ে আসছে। দুচোখ মুদে আসছ তার। একি শাম্মী তুমি আবার এসেছো......

......হাঁ আবার এলাম, তোমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে আমার কোলে মাথা রেখে তুমি ঘুমাও......

বনহুর শাম্মীর নরম কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লো।

হঠাৎ প্রচন্ড ধাক্কায় ঘুম ভেংগে গেলো বনহুরের। চোখ মেলে তাকালো সে, দেখলো দু'জন বলিষ্ঠ লোক তাকে ভীষণ জোরে জোরে ধাক্কা দিচ্ছে।

বনহুর ধড় মড় করে উঠে বসলো, এ লোক দুটিই সেই লোক যে তাকে প্রথমে বুড়ির সামনে ধরে এনেছিলো।

বনহুর ভাবলো সে তো শাম্মীর কোলে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলো, কিন্তু কই শাম্মী তো নাই। সে তো মেঝেতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। সব যেন কেমন গোলমেলে মনে হয়।

লোক দু'জন বনহুরকে বলে উঠে–এই তুমি মাংস খাওনি কেনো?

বনহুর বললো–মাংস আমি খাইনা।

তবে কি খাও?

ফল।

একজন অপরজনকে বললো–যাও ফল নিয়ে এসো, এ মাংস খায়না–ফল খাবে।

চলে গেলো একজন।

কিছুক্ষণের মধ্যে একটা ঝুড়িতে করে রাশি কৃত ফল নিয়ে হাজির হলো। মূল্যবান সুন্দর ফল, ঝুড়ি ভর্তি রয়েছে।

বনহুর এবার গো গ্রাসে খেতে শুরু করলো। ফল তার অতিপ্রিয়, এবার বনহুর পেট পুরে খেলো।

প্রায় অনেকগুলো ফল সে খেয়ে ফেললো। সেই বলিষ্ঠ লোক দু'জন তাকে খাবার সময় কোনরকম বাধা দিলোনা!

বনহুর খাওয়া শেষ করে বললো–তোমরা এবার বলো আমাকে কি করতে হবে?

ওরা বললো–আমরা কি বলবো। আমাদের মাতাজী যা বলবেন তাই হবে। চলো এবার মাতাজীর কাছে চলো।

বনহুর উঠে দাঁড়াতেই আবার তার হাত দু'খানা বেঁধে ফেললো ওরা। ইচ্ছা করলে বনহুর ওদের বাধা দিতে পারতো কিন্তু বাধা সে দিলোনা কারণ সে দেখতে চায় এ গভীর রহস্যর শেষ কোথায়। এখন মাথাটা তার অনেক সচ্ছ মনে হচ্ছে।

বনহুরকে নিয়ে ওরা এগিয়ে চললো।

এখন বনহুর বেশ ভাল ভাবেই হেঁটে চলেছে। পা দু'খানা আর টলছেনা–বা পৃথিবীটা দুলছেনা তার চোখের সামনে।

যে পথে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সে পথটা পৃথিবীর উপর নয় সে কথা বেশ বুঝতে পারছে বনহুর। সূর্যের আলো কোন চিহ্নই নাই সেখানে। শুধু ঝাপসা অন্ধকার চারিদিক।

যত এগুচ্ছে ততই একটু করে আলোর দেখতে পাচ্ছে বনহুর। কোথাও মশাল জ্বলছে; এ আলো তারই। বলিষ্ঠ জোয়ান লোক দু'জন তার পাশে এগিয়ে যাচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর একটা সুড়ঙ্গ মুখ সে দেখতে পেলো। লোক দু'জন বললো–ঐ দিক দিয়ে চলো।

বনহুর সেই সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশ করলো।

লোক দু'জন ঠিক তার পাশে পাশে এগুচ্ছে।

সুড়ঙ্গ পথে বেশ কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ একটা আর্তনাদ তার কানে ভেসে এলো, মর্মস্পর্শী করুণ আর্তনাদ! মুহূর্তের জন্য বনহুর থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। লোক দু'জন বলে উঠলো—ভয় নেই তোমাকে মাতাজী হত্যা করবে না।

বনহুর বললো—ও কিসের শব্দ?

দু'জন এক সঙ্গে বললো—মাতাজী কাউকে হত্যা করলো। আজ তার ভক্ষণের লাশ ফুরিয়ে গেছে।

বনহুর অবাক হলো, দু'জন যখন কথা বলে একই সঙ্গে বলে। হাসিও পায় বনহুরের ওদের কথা শুনে। আবার এগুলো ওরা।

একি এযে সেই চালা ঘর।

সেই বৃদ্ধ।

বৃদ্ধার সম্মুখে এক সদ্য মৃতদেহ। তখনও মৃতের চোখ দুটো মুদে যায়নি। গলার পাশে একটা গভীর ক্ষত সেই ক্ষত দিয়ে তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

বৃদ্ধার চোখে মুখে এক ভীষণ ভাব। দু হাতের নখে এবং তালুতে তাজা রক্তের ছাপ। দাঁত এবং মুখেও রক্তের দাগ লেগে রয়েছে। সেকি ভয়ঙ্করী চেহারা নর রাক্ষসী তাতে কোন ভুল নাই।

বনহুর কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করতেই বৃদ্ধ হেসে উঠলো—মাংস তুমি খাওনি। এবার তাজা রক্ত খাও......বৃদ্ধা কথাটা বলে একটা মাটির পাত্রে বেশ কিছুটা তাজা রক্ত নিয়ে এগিয়ে আসে।

বনহুরের হাত দু'খানা পিছনে বাঁধা, চোখ দুটো ক্রুদ্ধ সিংহের মত জ্বলছে। দু'পাশে দু'জন বলিষ্ঠ লোক দাঁড়িয়ে তাকে কড়া পাহারায় রেখেছে।

বৃদ্ধ রক্ত পূর্ণ পাত্র বনহুরের মুখের কাছে তুলে ধরে খাও বাছা খাও।

বনহুর মুখ সরিয়ে নিলো—না আমি রক্ত খাবো না।

তবে কি খাবে তুমি?

আমি ফল খেয়েছি।

রক্ত তোমাকে খেতে হবে...বৃদ্ধা পুনরায় রক্তের পাত্র বনহুরের সম্মুখে চেপে ধরলো—খাও......

না আমি খাবো না।

তখন লোক দু'জন বলিষ্ঠ হাতে বনহুরকে দু'পাশ থেকে চেপে ধরলো।

বৃদ্ধা রক্ত পাত্র বনহুরের মুখে ঢেলে দিতে গেলো। সেই মুহূর্তে বনহুর প্রচন্ড এক পদাঘাতে বৃদ্ধাকে ফেলে দিলো ভূতলে। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধার হাত থেকে রক্ত পাত্র–ছিটকে পড়লো দূরে। খান খান হয়ে ভেংগে গেলো পাত্রটা।

বৃদ্ধার দু'চোখে প্রতি হিংসার আগুন জ্বলে উঠলো, বৃদ্ধা উঠে দাঁড়ালো তারপর তার সঙ্গী দু'জনাকে লক্ষ্য করে বললো–একে বেঁধে রেখে শাস্তি দাও। যতক্ষণ না একে নর রক্ত পান করাতে সক্ষম হয়েছি, ততক্ষণ একে দিয়ে আমার কাজ হবেনা।

সঙ্গে সঙ্গে লোক দু'জন বনহুরকে টেনে নিয়ে চললো। পিছনে হাত বাধা থাকায় বনহুর বাধ্য ছেলের মত ওদের সঙ্গে এগুলো।

কোথায় তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সে জানেনা। অন্ধকারময় সুড়ঙ্গ পথ। দু'পাশে দু'জন বলিষ্ঠ লোক বনহুরকে টেনে হিচড়ে নিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে হোঁচট খাচ্ছে বনহুর, পড়েও যাচ্ছে কখনও কখনও।

কয়েক মিনিট চলার পর হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর কানে এলো বনহুরের, এ কণ্ঠস্বর যেন সে কোথায় শুনেছে। তাকালো সে সম্মুখের দিকে। আধো অন্ধকারে দেখলো সেই মূর্তি, সমস্ত দেহখানা তার সাদা ধপ ধপে আল খেল্লায় ঢাকা সেই 'যমদূত"।

বনহুর অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলো–তুমি। তুমি–বেঁচে আছো......

হাঁ, যমদূত কোনদিন মরেনা।

বনহুর বললো– তাহলে এসব তোমারই চক্রান্ত?

বুঝতেই পারছো। হাঁ শুনে রাখো মিঃ লিয়ন। তুমি যা করেছো তার ক্ষমা নাই। পাকিস্তানের বুকে বসে পাকিস্তানীদের কাজে বাদ সাধতে এসেছো। আমার বন্দী শিবির থেকে বহু বাঙ্গালীকে তুমি সরিয়ে ফেলেছো, আমাকে প্লেন থেকে সাগরে নিক্ষেপ করে হত্যাকরে আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছো। আমি সব জানতে পেরেছি তুমি জাফর হুসাইনকেও হত্যা করেছো। বলো নাসিমা কোথায়?

বনহুর তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে ছিলো সাদা ধপ ধপে আলখেল্লায় ঢাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র পথে চোখ দুটির দিকে। ক্ষুব্ধ শার্দূলের মত চোখদুটো যেন জ্বলছে। বনহুর দাঁতে দাঁত পিষে বললো–তোমার জবাব দেবো পরে। প্রথমে আমার প্রশ্নের জবাব দাও যমদূত? এই নর খাদক বৃদ্ধা তোমার কে এবং একে তুমি কি উদ্দেশ্যে প্রতি পালন করছো?

হেসে উঠলো যমদূত–বৃদ্ধাকে জানতে চাও?

হাঁ?

কিন্তু সে কাহিনী শুনে তোমার কোন লাভ হবেনা। কারণ তুমি এখন মাতাজীর যাদুজালে আচ্ছন্ন।

না, আমাকে কেউ যাদুজালে আচ্ছন্ন করতে পারবেনা। আমি তাকে হত্যা করবো......

খবরদার মাতাজী সম্বন্ধে এমন কথা মুখে আনবেনা। মাতাজীর দোয়ায় আমি আজ এতো বড় হতে পেরেছি। আজ আমি লাখো লাখো টাকার মালিক। হোটেল গুলবাগ আমার সম্পদ। সব আমি পেয়েছি মাতাজীর দোয়ায় আমার জীবন রক্ষাও পেয়েছে মাতাজীর জন্য......

বনহুর বুঝতে পারলো একটা অন্ধ বিশ্বাস, শয়তান যমদূত বেশি মিঃ প্রিন্সকে উন্মত্ত করে তুলেছে। একটা ডাইনী বুড়িকে পূজা করে চলেছে তারা। নর রক্ত আর নর মাংস ভক্ষণ করাই হলো ডাইনী বুড়ির নেশা। বনহুর কোন কথা বললোনা, ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলো যমদূতের দিকে।

যমদূত বলে উঠলো–মাতাজীর দোয়ায় তুমি এতোক্ষণও বেঁচে আছো মিঃ লিয়ন না হলে......

না হলে কি হতো? বললো বনহুর।

যমদূত জাবাব দিলো–তোমার রক্ত মাতাজীর পিপাসা পূর্ণ হতো।

হেসে উঠলো বনহুর ভীষণভাবে, তারপর বললো–আমার রক্ত পান করলে তোমার মাতাজীর পিপাসা পূর্ণ হবেনা শয়তান। তোমার রক্ত মাতাজী পান করবে। তোমার রক্তই তাকে আমি পান করাবো......

হিংস্র পশুর মত গর্জন করে উঠলো যমদূত।

বনহুর বললো–শয়তান তুমি বহুলোককে এ ভাবে শেষ করেছো আর তোমাকে এই নর হত্যা করতে দেবনা।

যমদূত সঙ্গে সঙ্গে বলিষ্ঠ লোক দুটিকে বললো–তোমরা একে মাতাজীর কাছে নিয়ে চলো। আমি এই মুহূর্তে এর রক্তে মাতাজীর পা ধৌত করবো।

বনহুরকে আবার সেই বলিষ্ঠ লোক দু'জন টেনে হিচড়ে নিয়ে চললো।

আবার সেই চালা ঘর।

একপাশে একটা প্রদীপ জ্বলছে।

বনহুরের চোখে কাপড় বেঁধে দেওয়া হয়েছিলো, এবার কাপড়খানা খুলে নেওয়া হলো। বনহুরের চোখ দুটো মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নজর পড়লো

সেই নর খাদক বৃদ্ধার মুখে। চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে।

যমদূত বেশি শয়তান মিঃ প্রিন্সও এসে হাজির হয়েছে সেখানে। যমদূত বৃদ্ধার কাছে নত জানু হয়ে তাকে অভিবাদন জানালো।

বৃদ্ধা বললো–কি চাও বাছা?

যমদূত বললো–মাতাজী আমি চাই এই যুবকের রক্ত আপনি পান করুন।

বৃদ্ধা বললো–আমি ওকে জীবিত রাখবো মনস্থ করেছিলাম। ভেবেছিলাম ওকে দিয়ে আমার অনেক কাজ হবে। ওর কপালে আমি এক শুভ নিদর্শন দেখতে পাচ্ছি।

না আমি কোন কথাই শুনবনা ওকে আপনি হত্যা করুন। ওকে জীবিত রাখলে আমাদের চরম ক্ষতি হবে।

বৃদ্ধা এবার ক্রুদ্ধ রক্ত পিপাষু দৃষ্টি নিয়ে তাকালো বনহুরের দিকে।

যমদূত নিজে সরে এসে বনহুরকে এঁটে ধরলো।

পূর্ব হতেই দু'জন দু'পাশে ধরে আছে শক্ত করে। হাত দু'খানা বনহুরের পিছনে বাঁধা রয়েছে এখনও।

এগিয়ে আসছে সেই নর খাদক বৃদ্ধা। তার ডানহাতে সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরা। বাম হাতখানা সম্মুখে প্রসারিত । চোখ দুটো আগুনের ভাটার মত জ্বলছে। রক্তের নেশায় উন্মত্ত বৃদ্ধা ঝাপিয়ে পড়লো বনহুরের উপর।